1104

শিখগুরু ও শিখজাতি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত
বোলপুর শান্তিনিকেতন
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

এলাহাবাদ ঃ—ইণ্ডিয়ান প্রেস
কলিকাতা ঃ—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
হইতে প্রকাশিত
১৯১০

মূল্য এক টাকা মাত্র

Printed and Published by Panchkory Mitra,
at
the Indian Press, Allahabad

26 NOV 313
COOCH BEHAR

ভূমিকা

শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠাইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠাইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজি হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠাজাতির অবতারণ করিয়াছিলেন; তিনি দেশজয়, শত্রুবিনাশ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারত-ব্যাপী একটী বৃহৎ সঙ্কল্পের অঙ্গ ছিল।

আর গোড়ায় ধর্ম্মের ইতিহাসরূপে শিখ-ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে; যে দেবপূজা কেবল দেশ-বিশেষের, জাতি-বিশেষের কল্পনা ও অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না এবং বাধা পায়, নানকের ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই;—এইসকল সঙ্কীর্ণ পৌরাণিক ধর্ম্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শিখ অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

জাতিনির্ব্বিচারে সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। অতএব নানকের অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া কোনো জাতিগত ইতিহাস যে গড়িয়া উঠিবে এরূপ লক্ষণ প্রথমে দেখা যায় নাই।

কিন্তু মোগলদিগের নিকট হইতে অত্যাচার পাইয়া এই নানকশিষ্যের দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে সংহত হইয়া দাঁড়াইল এবং সেই কারণেই সর্ব্বসাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা আত্মদলকে বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। এইরূপে বাহির হইতে চাপ পাইয়াই শিখ একটি ঘনিষ্ঠ জাতি হইয়া দাঁড়াইল।

শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন এই কাজেই তিনি বিশেষভাবে লাগিলেন। সর্ব্বমানবের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যকে সংহত করিয়া লইয়া শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

এ কাজ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপ্রচারকের নহে—ইহা প্রধানতঃ সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞের কাজ। গুরুগোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বাঁধিয়া তুলিয়া বৈরনির্য্যাতনের উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন।

গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড় করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।

ইহার পর হইতে কেবল লড়াই এবং রাষ্ট্র-বিস্তারের ইতিহাস। এদিকে মোগলশক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং শিখদল তাহাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে যতই কৃতকার্য্য হইতে লাগিল ততই আত্মরক্ষার চেষ্টা ঘুচিয়া গিয়া ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

যতদিন বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই একান্ত হইয়া উঠে, ততদিন এক-বিপদের তাড়নায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় থাকে। বাহিরের সেই চাপ সরিয়া গেলে এই বিজয়মদমত্ততাকে কিসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে? আত্মরক্ষাচেষ্টায় যে যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠে অন্যকে আঘাত করিবার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় সেই শক্তিকে কে নিযুক্ত করিতে পারে?

যে শক্তি তাহা পারিত আশু-প্রয়োজন-সাধনের অতিলোলুপতায় গুরুগোবিন্দ তাহাকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। গুরুর পরিবর্ত্তে তিনি শিখদিগকে তরবারি দান করিলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন নানকের প্রচারিত মহাসত্য গ্রন্থসাহেবের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তাহা গুরু-পরম্পরায় জীবনপ্রবাহে ধাবিত হইয়া মানবসমাজকে ফলবান্ করিবার জন্য অপ্রতিহতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল না; এক জায়গায় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুব্ধ এবং অসংযত হইয়া উঠিল। তখন দেবতার তিরোধানে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব হইল, কাড়াকাড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়া উঠিল।

এই উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘাতসাধনের মধ্যে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় হইল। তিনি কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবলমাত্র বলের দ্বারা। তিনি সকলের চেয়ে বলশালী বলিয়া সকলকে দমন করিয়াছিলেন।

বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে দুর্ব্বল করিয়াই এক করে—শুধু তাই নয়, ঐক্যের যে চিরন্তন মূলতত্ত্ব প্রেম তাহাকেই

পর্য্যস্ত করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করে। রণজিৎ সিংহ স্বার্থপুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছিলেন।

শিখ-সম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি এমন কোনো মহৎভাবের সঞ্চার করেন নাই, যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবলমাত্র অপ্রতিহত চাতুরীপ্রভাব এবং স্বার্থসাধন-সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন।

তাঁহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগস্পৃহা অসংযত ছিল। একটিমাত্র তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে নাই। একটীমাত্র স্থানে তিনি আপনার দুর্দ্দম ইচ্ছাকে সংযত করিয়াছিলেন—অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াও ভারত-মানচিত্রে তিনি ইংরাজের রক্তগণ্ডীকে লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি এইখানে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল।

যাহা হউক, তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত মানুষকে যত বিপদে ফেলিয়াছে এমন আর কিছুতেই না। এই দৃষ্টান্তে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে পরাস্ত এবং তাহার লুব্ধ প্রবৃত্তিকে অশান্ত করিয়া তোলে—ইহা অপঘাতমৃত্যুরই পথ।

যাঁহা হইতে শিখসম্প্রদায় আরম্ভ হইয়াছিল, সেই নানক অকৃত-কার্য্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই জন্য তিনি তাঁহার বণিক্ পিতার কাছে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। লবণের কারবারে নানক কিরূপ লাভ করিয়াছিলেন সে কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যে শক্তিতে জাঠকৃষকেরা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে অবজ্ঞা করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল, সে শক্তি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিয়াছিলেন।

আর যে মহারাজ কৃতকার্য্যতার আদর্শস্থল—শিখদের চিরন্তন শত্রুকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, কোনো পরাভবেই যাঁহার ইচ্ছাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই—একদিকে মোগলরাজ্যাবসান ও অন্যদিকে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সন্ধ্যাকাশকে যাঁহার আকস্মিক প্রতাপ রক্তরশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কি রাখিয়া গেলেন? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা।

শিখদের যাহারা নায়ক ছিল তাহারা এই কৃতকার্য্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল—অর্থাৎ দীনহীন নানক যে শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন—মহাপ্রতাপশালী মহারাজ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং ইতিহাসের আকাশে শিখ-জ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।

আজ শিখের মধ্যে আর কোনো অগ্রসর গতি নাই। তাহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বাঁধিয়া গেছে—তাহারা আর বাড়িতেছে না—তাহাদের মধ্যে বহু শতাব্দকালেও আর কোনো মানবগুরুর আবির্ভাব হইল না—জ্ঞানে-ধর্ম্মে-কর্ম্মে মানবের ভাণ্ডারে তাহারা কোনো নূতন সম্পৎ সঞ্চিত করিল না।

নানকশিষ্যেরা আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো কাবুলে কখনো চীনে কখনো আফ্রিকায় লড়াই করিয়া বেড়াইবে, নানকের ধর্ম্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তরবংশীয়দের এই পরিণামই যে গৌরবজনক এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না। মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে তাহারা কেবল বারিকে বসিয়া কুচকাওয়াজ করিবে এজন্য নানক জীবন উৎসর্গ করেন নাই।

নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে স্বার্থপরতা হইতে, ধর্ম্মবোধের সঙ্কীর্ণতা হইতে, আধ্যাত্মিক অসাড়তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি তাহাদের মনুষ্যত্বকে বৃহদ্‌ভাবে সার্থক করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ এই শিখদিগকে বিশেষ একটি প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন—এবং যাহাতে তাহারা সেই প্রয়োজনকে কিছুতে বিস্মৃত না হয় সেইজন্য তাহাদের নামে বেশে ভূষায় আচারে নানা প্রকারে সেই প্রয়োজনটিকে তাহাদের চিত্তের মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন—এইরূপে শিখদের মনুষ্যত্বের উদ্যমধারাকে অন্য সকল দিক হইতে প্রতিহত করিয়া তিনি একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত করিলেন। ইহার দ্বারা একটা প্রয়োজনের ছাঁচের মধ্যে শিখজাতি বদ্ধ হইয়া শক্ত হইয়া তৈরি হইল।

যখন শিখরা মুক্ত মানুষ না হইয়া বিশেষ প্রয়োজনযোগ্য মানুষ হইল, তখন প্রবল রাজা তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইলেন এবং এইরূপে আজপর্য্যন্তও তাহারা প্রবলকর্ত্তৃক বিশেষ প্রয়োজনেই লাগিতেছে। স্পার্টার গ্রীস যখন নিজের মানবত্বকে বিশেষ প্রয়োজনের অনুসারে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তখন সে যুদ্ধ করিতে পারিত বটে কিন্তু আপনাকে খর্ব্ব করিয়াছিল; কারণ, যুদ্ধ করিতে পারাই মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে। এইরূপে মানুষ আশু প্রয়োজনের জন্য নিজের শ্রেয়কে নষ্ট করে, এমন উদাহরণ অনেক আছে এবং আজপর্য্যন্ত এই অদূরদর্শিলুব্ধতার তাড়নায় সকল সমাজেই মনুষ্যবলি চলিতেছে। যে নররক্তপিপাসু অপদেবতা এই বলিগ্রহণ করে সে কখনো সমাজ, কখনো রাষ্ট্র, কখনো ধর্ম্ম এবং কখনো তৎকালপ্রচলিত কোনো একটা সর্ব্বজনমোহকর নাম ধরিয়া মানুষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

শিখ-ইতিহাসের পরিণাম আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ঠেকে।

যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতের পবিত্র শুভ্রশিখর হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সে যখন পথের মধ্যে বালুকারাশির অভ্যন্তরে লুপ্ত হইয়া তাহার গতি হারায়, তাহার গান ভুলিয়া যায়, তখন সেই ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়—তেমনি ভক্তের হৃদয় হইতে যে শুভ্রনির্ম্মল শক্তিধারা বিশ্বকে পবিত্র ও উর্ব্বর করিতে বাহির হইয়াছিল আজ তাহা যখন সৈন্যের বারিকে রক্তবর্ণ পঙ্কের মধ্যে পরিশোষিত হইয়া গেল তখন মানুষ ইহার মধ্যে কোনো গৌরব বা আনন্দ অনুভব করিতে পারে না।

এই শিখ-ইতিহাস একদিন প্রতিজিঘাংসা অথবা অন্য কোনো সঙ্কীর্ণ অভিপ্রায়ের আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মানব-সফলতা-ক্ষেত্র হইতে স্খলিত হইয়াছে কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্নতর যে জাতীয় সফলতার ক্ষেত্র সেখানেও কোনো গৌরবলাভ করিতে পারে নাই। রণজিৎসিংহ যে রাজ্য বাঁধিয়াছিলেন তাহা রণজিৎ সিংহেরই রাজ্য—গোবিন্দসিংহ মোগলদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র শিখ-সম্প্রদায়েরই সংগ্রাম। নিজের শিষ্যদলের বাহিরে তিনি সঙ্কল্পকে প্রসারিত করেন নাই।

এইখানে মারাঠা-ইতিহাসের সঙ্গে শিখ-ইতিহাসের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দু-ধর্ম্মকে মুসলমানশাসন হইতে মুক্তি দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা আয়তনে শিখজাতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক—সুতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরুগোবিন্দ এবং শিবাজী উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। তখন আকবরের

উদারবাষ্ট্রনীতির অবসান হইয়াছিল এবং সেইজন্তই মোগলশাস তখন ভারতবর্ষের অ মুসলমানধর্ম্ম ও সমাজকে আত্মরক্ষায় জাগরূক করি তুলিয়াছিল।

বস্তুত তখন ভিতরে বাহিরে আঘাত পাইয়া সমস্ত ভারতবা নানাস্থানেই একটা যেন ধর্ম্মচেষ্টার উদ্বোধন হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম সমাজে তখন যে একটি জীবনচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে তাহা নানা সাধুভক্তকে আশ্রয় করিয়া নব নব ধর্ম্মোৎসাহে প্রকা পাইয়াছিল। সেইরূপ সচেতন অবস্থায় ঔরঙ্জেবের অত্যাচারে শিবাজী ন্যায় বীরপুরুষ যে ভারতবর্ষে স্বধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ব্রত গ্রহ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আবার ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে এই সময়ে নবভাবোদ্দীপ্ত শিখ ধর্ম্মের প্রভাবে শিখ-সম্প্রদায়ের চিত্তও প্রাণপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল সেই কারণেই মোগলশাসনের পীড়ন তাহাকে দমন করিতে পা নাই, বরঞ্চ তাড়নাপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহাকে উগ্যত করিয়া তুলিয়াছিল

কিন্তু যদিচ ভিতরকার প্রভাব ও বাহিরের আঘাত উভয়ের পক্ষে একই রকম ছিল তথাপি তাহার ক্রিয়া গুরুগোবিন্দ এবং শিবাজী মধ্যে একভাবে প্রকাশ পায় নাই।

গুরুগোবিন্দ মোগলদের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছেন কিন্ত তাহা কেমন থাপছাড়া মত। প্রতিহিংসা এবং আত্মরক্ষাসাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু শিবাজী যে সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহ সোপানপরম্পরার মত; তাহা রাগারাগি—লড়ালড়িমাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্ব্বিকতা ছিল

তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি বৃহৎ অভিপ্রায়সাধনের উদ্যোগ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, শিখ ও মারাঠা উভয়জাতিরই ইতিহাস একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যে উদ্দেশ্য সমস্ত দেশকে অধিকার করিতে চাহে তাহা কেবল একজন বা কয়েকজনমাত্র মনস্বী লোককে আশ্রয় করিয়া সফল হইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গকে শিখা করিয়া তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে চকমকি ঠুকিলেই চলে না, উপযুক্ত পলিতারও আবশ্যক হয়। শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এই জন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক্ না, তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টারূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই, এইজন্যই মারাঠার এই উদ্যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গির উপদ্রবরূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

যে মঙ্গল সকলের, তাহাকে সকলের চিত্তের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, যদি তাহা কেবল আমার বা আমার দলের কয়েকজনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তবে তাহার মঙ্গলরূপ ঘুচিয়া যায় এবং অন্যের পক্ষে ক্রমে তাহা উৎপাত হইয়া উঠে।

শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতারূপে কলুষিত হইয়া উঠিল। এমন বিকার কদাচ ঘটিত না যদি এই ভাবটি দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে প্রসারিত হইবার পথ প্রশস্ত থাকিত। তাহা হইলে বৃহৎ আধারের মধ্যে বৃহৎ ভাব আপনার স্থান এবং খাদ্য পাইত, তাহা হইলে একটা কাঠ যখন নিবিবার মত হইত তখন কোথা হইতে আর একটা কাঠ আপনি জ্বলিয়া উঠিত।

আমাদের দেশে বারংবার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্ভব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান, তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।

ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা। যে মাটিতে আঁঠা একেবারে নাই সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখীর মুখে বীজ আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অথবা দু-চারটি পাতা বাহির হইয়া মুষড়িয়া যায়, কারণ, সেখানকার আলগা মাটি রস ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আর অন্ত নাই; ধর্ম্মে কর্ম্মে, আহারে বিহারে, আদানে প্রদানে সর্ব্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। এই জন্য ভাবের বন্যা নামে কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়, তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে কিন্তু ইতস্ততঃ সামান্য ধোঁয়া জাগাইয়া নিবিয়া যায়—এইজন্য মহৎচেষ্টা বৃহৎচেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্ব্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন।

যাহা হউক্ মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ-সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, শিখ একদা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ভাবের আহ্বানে একত্র হইয়াছিল—এমন একটি সত্যধর্ম্মের বার্ত্তা তাহারা শুনিয়াছিল, যাহা কোনো স্থানবিশেষের চিরাগত প্রথার মধ্যে বদ্ধ নহে এবং যাহা কোনো সময়বিশেষের উত্তেজনা হইতে প্রসূত হয় নাই—যাহা চিরকালের এবং সকল মানবের, যাহা ছোটবড় সকলেরই অধিকারকে প্রশস্ত করে, চিত্তকে মুক্তি দেয় এবং যাহাকে স্বীকার করিলে প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের পূর্ণতম গৌরবকে উপলব্ধি করে। নানকের এই উদার ধর্ম্মের আহ্বানে বহুশতাব্দী

করিয়া শিখ বহু দুঃখ সহ্য করিয়া ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছিল। এই ধর্ম্মবোধ ও দুঃখভোগের গৌরবে শিখদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি মহৎ ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

গুরু গোবিন্দ শিখদের এই ধর্ম্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্ম্মসাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মসমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতিলাভের উপায়রূপে খর্ব্ব করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সম্প্রদায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়া তিনি তাহার ঐক্যকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইলেন — যে জাতিভেদ তাহার প্রবল অন্তরায় ছিল তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলেন।

গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যসমাজের মধ্য হইতে এই যে ভেদবিভাগকে এক কথায় দূর করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, নানকের উদার ধর্ম্মের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধির ব্যবধান আপনিই তলে তলে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। গুরুগোবিন্দ তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহা শতখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে গভীরতররূপে যদি ইহার আয়োজন না থাকিত তবে সহস্র প্রয়োজন হইলেও গুরুগোবিন্দ কিছুই করিতে পারিতেন না। শুধু তাহাই নয়, সকল কর্ম্মনাশা এই ভেদকে দূর করিতে হইবে এই সঙ্কল্পমাত্রও তাঁহার মনে আকার গ্রহণ করিতে পারিত না।

কিন্তু গুরুগোবিন্দ কি করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন, অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর একজন প্রবল সরিক বসাইয়া দিলেন।

ঐক্যই ভাবের বাহন। এইকারণে মহৎভাবমাত্রই সেই বাহনকে

সৃষ্টি করিবার জন্য আপনার শক্তিকে নিযুক্ত করে। বাহনের গৌ তাহার আরোহীর মাহাত্ম্যে। গুরুগোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজন ও প্রয়োজনবোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে কিন্তু আরোহী খর্ব্ব করিয়া দিলেন।

তাহা হইতে ফল এই হইল, উপস্থিতমত কিছু কিছু কার্য্যসি ঘটিল কিন্তু যাহা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা বন্ধনে পড়িল শিখদের মধ্যে পরস্পরকে নিবিড় করিবার ব্যবস্থা রহিল কিন্তু অগ্রস করিয়া দিবার বেগ রহিল না। এই জন্য বহুশতাব্দী ধরিয়া যে শি পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এক সম থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল—এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শে হইয়া গেল।

শিবাজী যে উদ্দেশ্যসাধনে তাঁহার জীবন প্রয়োগ করিয়াছিলে তাহা কোনো সঙ্কীর্ণ সাময়িক প্রয়োজনমূলক ছিলনা এবং পূর্ব্ব হইতে দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগুরুদের প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয় ছিল। এইজন্য তাঁহার উৎসাহ কিছুকালের জন্য যেন সমস্ত মারাঠা জাতির মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছিল।

ফাটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জ থাকে না। ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মনে হয় সমস্ত বুঝি ছাপাইয়া এক হইয়া গেল কিন্তু ছিদ্রের কাজ ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ—কোনো ভাবকে তাহা ধরিয় রাখিতে পারেনা এই জন্য এই সমাজে প্রাণময় ভাবের পরিবর্ত্তে শুষ্ক নির্জ্জীব আচারের এমন নিদারুণ প্রাদুর্ভাব।

শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দুসমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্ত্তন এতটা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও

কিছুদিনপর্য্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন কি, চেষ্টামাত্র করেন নাই, সমাজের বড় বড় ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনি পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর কোনো উপকরণ ছিলনা বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগলআক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিষ। সেই বিভাগমূলক ধর্ম্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা —ইহাই অসাধ্যসাধন।

শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে ; কারণ ধর্ম্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, এমন কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সেই শতদীর্ণ ধর্ম্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধান-সঙ্গত হইতে পারে না। কেবল আঘাত পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমান করিয়া কোনো জাত বড় হইতে জয়ী হইতে পারে না—যতক্ষণ তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব কাজ করিবার

স্থান না পায়—যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোনো মহৎভাবের অমৃতরা
চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এ
করিবার অভিমুখে না লইয়া যায় ততক্ষণপর্য্যন্ত বাহিরের কো
আঘাতে ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিবিশেষের কোনো বীরত্বেই তাহা
দৃঢ়ঘনিষ্ঠ তাহাকে সজীবসচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন।

এই পুস্তকে শিখদের উত্থানপতনের ধারাবাহিক আখ্যান বলা হইয়াছে। পুস্তকখানিকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি।

পুস্তকখানি রচনাকরিবার সময়ে আমি জেনারেল গর্ডন, ডি ক্যানিংহাম ও ম্যাগ্রেগর প্রণীত শিখ-ইতিবৃত্ত, স্যার লেপেল গ্রিফিনের রচিত 'রণজিৎ', মেজর হেনরী কোর্টের অনূদিত 'শিখ্থন্ দে রাজ দি বিথিয়া' অর্থাৎ 'শিখ-রাজত্ব-কথা', মেকলিফের অনূদিত 'শিখধর্ম্ম', 'নানক-প্রকাশ' ও ভারতীপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধহইতে সাহায্য পাইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-রচয়িতা ও প্রবন্ধলেখকদের নিকট আমি আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
শান্তিনিকেতন—বোলপুর
১লা বৈশাখ, ১৩১৭

শ্রীশরৎকুমার রায়।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	
প্রথম অধ্যায়—শিখজাতির আদিমবিবরণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—বাবা নানকের জীবন কথা	৪
তৃতীয় অধ্যায়—শিখধর্ম্মের ব্যাপ্তি	
গুরু অঙ্গদ	১৫
গুরু অমরদাস	১৭
গুরু রামদাস	১৯
গুরু অর্জ্জুন	২০
গুরু হরগোবিন্দ	২৪
গুরু হর রায়	২৬
গুরু হরকিষণ	২৭
তেগ বাহাদুর	২৮
চতুর্থ অধ্যায়—শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ও খালসা সমাজ প্রতিষ্ঠা (১)	৩৩
পঞ্চম অধ্যায়—শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ও খালসা সমাজ প্রতিষ্ঠা (২)	৩৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ষষ্ঠ অধ্যায়—বন্দা	৫৩
সপ্তম অধ্যায়—স্বাধীনতা লাভ	৬০
অষ্টম অধ্যায়—শিখ মিশল বা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান	৭৩
নবম অধ্যায়—রণজিৎ ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ	৮১
দশম অধ্যায়—রণজিতের সংসারপ্রবেশ ও শিখ দলপতিগণের সহিত সংগ্রাম	৮৫
একাদশ অধ্যায়—রণজিৎ ও পাঞ্জাবী মুসলমান	৯৩
দ্বাদশ অধ্যায়—ইংরাজ ও রণজিৎ	৯৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়—রণজিৎ ও তাঁহার সহযোগিগণ	১০৪
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—রণজিৎ ও শিখসৈন্য	১১৬
পঞ্চদশ অধ্যায়—রণজিতের রাজ্যবিজয়	১২১
ষোড়শ অধ্যায়—সীমান্ত সংগ্রাম	১২৯
সপ্তদশ অধ্যায়—রণজিতের অন্তিম জীবন	১৩৪
অষ্টাদশ অধ্যায়—শিখ-রাজ্যের পতন	১৩৬
ঊনবিংশ অধ্যায়—স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি	
প্রথম শিখযুদ্ধ	১৪৫
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ	১৫১

শিখগুরু ও শিখজাতি

প্রথম অধ্যায়

শিখজাতির আদিম বিবরণ

পঞ্জাবে "জাঠ" নামধারী এক বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় জাতি বাস করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাবা নানক এই জাঠকৃষকদিগকেই তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শিখ বা শিষ্য করেন।

অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে এই জাঠেরা শক (সাইথিয়ান) (Scythian) জাতির একটি শাখা। মধ্য এশিয়ার মালভূমি ইহাদের আদিম বসতিস্থান। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ও পরে ইহারা দলে দলে পঞ্চনদ দেশে প্রবেশ করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তখন ইহারা মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল।

ভারতীয় আর্য্যেরা এই নবাগত আক্রমণকারীদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাশ, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা "হূণ" নামক শকজাতীয়দিগকে (সাইথিয়ানদিগকে) তাড়াইয়া দিয়া কিছু কালের জন্য রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

যে শকদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের এক ভাগ মাসা-জিটিস্ (Masse-getes) নামে খ্যাত ছিল, এই জিটিস্‌গণ হইতেই জাঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

মহাবীর আলেকজাণ্ডর যখন এশিয়া মহাদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তখন আরিয়ান নামক একজন ঐতিহাসিক তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। উক্ত ঐতিহাসিক মহোদয় তাইগ্রীস্ নদীর তীরবর্ত্তী আরবেলা (Arbela 331. B. C.) ক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ বর্ণনা-উপলক্ষ্যে লিখিয়াছেন যে, পারস্যরাজ দরায়ুসের (Darius) সৈন্যদলের মধ্যে ভারতীয় শকজাতীয় (সাইথিয়ান) জিটিস্ সৈন্যেরা সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিল।

রাজস্থানের পুরাবৃত্ত-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল টডের লেখা হইতে জানা যায় যে, মধ্য এশিয়া হইতে আগত (শকজাতীয়) জিটিস্‌দের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে জিঠি, জোঠি, জুঠি, জোঠ, জিঠ ও জাঠ হইয়া গিয়াছে। কর্ণেল সাহেব যখন রাজস্থানের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছিলেন তখন, (প্রায় আশী বছর পূর্ব্বে) রাজপুতনা ও পঞ্জাব প্রদেশে জিঠ ও জাঠ এই দুই নাম প্রচলিত ছিল। তিনি একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উহা হইতে জানা গিয়াছে যে জিঠেরা পঞ্চম শতাব্দীতে পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল ভারতীয় শকদের মধ্য এশিয়ার জ্ঞাতিগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ দল বাঁধিয়া একাদশ শতাব্দীপর্য্যন্ত এদেশে আসিয়া দলপুষ্টি করিয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল ;—মুসলমানদিগের আক্রমণে অক্‌সাস্ নদীর তীরবর্ত্তী শকদের রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহাদের একদল ভারতবর্ষে জ্ঞাতিদের নিকট

আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় জিটিস্‌গণ এত দিনে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গজনী মামুদের প্রথম ভারতআক্রমণের বিবরণমধ্যে ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের এক প্রান্তবাসী এই জাঠ সম্প্রদায়ের সহিত দুই শত বৎসর যুদ্ধের পর মুসলমানেরা ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

একদিন যে জাঠ সম্প্রদায় নিতান্ত নগণ্য ছিল, এখন মুসলমান-দিগের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের নাম প্রচারিত হইতে লাগিল। এতদিন তাহারা খণ্ড-ক্ষুদ্র ছিল, এখন জমাট বাঁধিয়া একটা দল হইয়া পড়িয়াছে। মামুদের সৈন্যদলকে ইহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১০২৭ খৃষ্টাব্দে মামুদ ইহাদের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের সহিত ইহাদের একটা ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তৈমুর ইহাদিগের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আমি যতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছি দলে দলে জাঠেরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।" তিনি যাহাদিগকে জিঠ আখ্যা দিয়াছেন, তাহারাই পঞ্জাবে জাঠ নামে খ্যাত ছিল।

বহু যুদ্ধ বিগ্রহ, অরাজকতা সহ্য করিয়া অনেক লাঞ্ছনা তাড়না স্বীকার করিয়া এই জাঠ সম্প্রদায় পঞ্জাবকে আপনার দেশ করিয়া লইয়াছিল। কতবার এই সম্প্রদায়কে বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী অরণ্যে পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে; আবার প্রবল শত্রুরা চলিয়া গেলে পর তাহাদিগকে নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সাধ্যাতীত। যে ভারতীয় আর্য্যেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিত, ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহারা তাহাদিগের ধর্ম্ম, ভাষা, তাহাদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোক পাইয়াই

প্রাচীন বর্ব্বরতা ধুইয়া মুছিয়া সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছিল; অথচ ইহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের আচার হইতে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয় নাই। তাহাদের তেজ ও বীর্য্য ইহারা প্রচুরপরিমাণে লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাবা নানকের জীবনকথা

ইংরাজী ১৪৬৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গলা ৮৯২ সনে কার্ত্তিক মাসের পুর্ণিমা তিথিতে লাহোরের অদূরবর্ত্তী তালবণ্ডী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালু বেদীবংশীয় ক্ষত্রিয়, মাতার নাম ত্রিপতা। পিতা কালু জাতিতে জাঠ; কৃষি ও সামান্ত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন।

স্বাভাবিক বৈরাগ্য লইয়াই নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণত যে বয়সে শিশুরা খেলা ধূলায় মাতিয়া থাকে, সেই সুকুমার বয়সেই নানক চিন্তাশীল, মিতভাষী ও উপাসনা-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি শৈশবেই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পাঁচ বছর বয়সে তিনি গ্রামের শিক্ষক গোপাল পাঁধার পাঠশালায় প্রেরিত হন। সেই শিশুবয়সেই তিনি "ঈশ্বর আছেন তাহার প্রমাণ কি?" ইত্যাদি রূপ জটিল তত্ত্বমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়কে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিতেন। পাঠশালার লেখা পড়া শেষ করিয়া নানক

বৈগুনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও কুতবুদ্দিন মুল্লার নিকট পারসী শিক্ষা করেন। বালকের ধী-শক্তি ও চরিত্র-মাধুর্য্য উভয় শিক্ষককেই মুগ্ধ করিয়াছিল। জন্মসাক্ষীগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নানক সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ অবলম্বনে এক একটি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া শিক্ষক দুই জনকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

নানকের বাল্যজীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ; আমরা সেগুলি বিশ্বাস করি না এবং এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমারা একটিমাত্র বিশ্বাস-যোগ্য প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিব—

একদিন বালক নানক বিপাশা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; নিকটে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তর্পণ করিতে দেখিয়া তিনি হস্তদ্বারা তীর-ভূমিতে জল সেচন করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক বালককে বিনা প্রয়োজনে এইরূপ জল সেচন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিলেন—"বালক তুমি জল লইয়া কি করিতেছ?" বুদ্ধিমান্ বালক উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—"আপনারা জল দ্বারা ও কি করিতেছেন?" জনৈক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"আমাদিগের পরলোকগত পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে জলদান করিতেছি।" নানক উত্তর করিলেন—"আমি আমার তালবণ্ডীর শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তুমি কি নির্ব্বোধ, তোমার শাকের ক্ষেত রহিয়াছে তালবণ্ডীতে, আর এখানকার ভূমিতে তুমি জল ছড়াইতেছ, এই জল দ্বারা কি সেই ক্ষেত্র সিক্তি হইবে?" নানক বলিয়া উঠিলেন—"কে বেশী নির্ব্বোধ? তুমি না আমি? তুমিই বলিতেছ যে আমার এই জল কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তালবণ্ডীতে পঁহুছিবে না; তবে

তোমার প্রদত্ত ঐ জল কি করিয়া তোমার পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট পঁহুছিবে ?" বালকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অবাক্ হইয়া গেলেন।

নয় বছর বয়সে উপবীতগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া নানক কুল-পুরোহিত হরিদয়াল পণ্ডিতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। নয় বছরের বালক, উপবীত গলদেশে প্রদান করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পণ্ডিত মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি যে উপবীত প্রদান করিতে আনিয়াছেন, তাহা ধারণ করিলে আমার কি লাভ, না করিলেই বা কি ক্ষতি হইবে ?"

পণ্ডিত বলিলেন—"উপনয়নসংস্কার হইলে তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইবে, যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার অধিকার জন্মিবে।" পণ্ডিত মহাশয়ের এই উত্তরে নানক সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি শ্লোক বলিয়া উঠিলেন—"দয়ারূপ কার্পাস, সন্তোষরূপ সূত্র, ইন্দ্রিয়দমনরূপ গ্রন্থি ও সত্যরূপ দণ্ডী যে উপবীতের তাহাই জীবের যথার্থ উপবীত। হে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে তাহা ধারণ কর। ইহা ছিন্ন বা মলিন হয়না; অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। হে নানক, সেই মনুষ্য ধন্য, যে এইরূপ উপবীতধারী হইয়া সংসারে বিচরণ করে।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানকের ধর্ম্মানুরাগ বাড়িতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সংসারের কার্য্যাদিতে ও ধনোপার্জ্জনে নানক নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। পুত্রের এই প্রকার সংসারে ঔদাসীন্য ঘোর সংসারী ধনলোভী কালুকে পীড়িত করিত। ধর্ম্মভাবে বিহ্বল পুত্রকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া তিনি মাঝে মাঝে গভীর শোক করিতেন। তাঁহার মতি ধনোপার্জ্জনের দিকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত পিতা তাঁহাকে গোমহিষ-চারণে ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নানক পিতৃনিদেশে গো মহিষ লইয়া প্রান্তরে গমন করিতেন। তথায়

পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে তরুতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। গো মহিষগুলি কাহার শস্য নষ্ট করিত নানক তাঁহার খোঁজ লইবার অবসর পাইতেন না। পিতা কালু উত্ত্যক্ত হইয়া নানককে এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিলেন। পিতা তাঁহাকে বারংবার কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলায়, নানক এই সময়ে বলিয়াছিলেন—"হে পিতঃ, আমি একখানি নূতন ক্ষেত পাইয়াছি, সেই ক্ষেতের কর্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, এই সময়ে আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইতেছে। এমন সময়ে আমার অন্যের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর নাই, তাহার ভারও লইতে পারি না।"

পুত্র এইরূপ তাঁহার নবীন ধর্ম্মানুরাগের কথা পিতাকে নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সংসারী পিতা তাঁহার ভাবের গভীরতা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নানককে অকর্ম্মণ্য মনে করিলেন।

নবীন ঈশ্বরপ্রেমে নানক মাতোয়ারা হইলেন। তিনি মৃতের ন্যায় রাত্রিদিন একস্থানে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইল। মাতা ত্রিপতার অনুরোধে কালু চিকিৎসক ডাকাইলেন। চিকিৎসক আসিয়া রোগীর নাড়ী ধরিবামাত্র নানক একটী শ্লোক বলিয়া উঠিলেন—"বৈদ্য আসিয়া হাত ধরিয়া নাড়ী খুঁজিতেছে, কিন্তু ভ্রান্ত বৈদ্য জানে না যে তাহার আপনার বুক দুঃখে পরিপূর্ণ। হে বৈদ্য, তুমি সুচিকিৎসক, প্রথমে কি রোগ হইয়াছে তাহা স্থির কর। এইরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে যদ্দ্বারা সমস্ত দুঃখ ও রোগ দূর হইয়া নিত্য সুখ লাভ হয়। হে বৈদ্য, তুমি আগে আপনার রোগ দূর কর, তাহা হইলে বুঝিব তুমি সুচিকিৎসক।"

নানকের পিতা তাঁহাকে সংসারের কাজে লাগাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হাতে কিছু টাকা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এক গাঁয় নুণ কিনিয়া আর এক গাঁয় বিক্রয় করিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু নামক এক ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া নুণ কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের সাক্ষাৎকার হয়। সাধুদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে খুব আনন্দ হইল। ফকিরদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিবেন ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের কাছে গেলেন। কাছে গিয়া দেখেন, তিন দিনের উপবাসে তাঁহাদের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ধর্ম্মানুরাগী নানকের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কাতরভাবে বালসিন্ধুকে বলিলেন—"আমার পিতা কিছু অর্থলাভের জন্য নুণের ব্যবসায় করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে লাভের টাকা কতদিন থাকিবে? আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকার দ্বারা দরিদ্র সাধুদিগের দুঃখ মোচন করিয়া অনন্তকাল স্থায়ী পুণ্য উপার্জ্জন করি।" বালসিন্ধু নানকের সাধু প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। নানক সমস্ত অর্থ ফকিরদিগকে দান করিলেন। তাঁহারা আহারান্তে সুস্থ হইয়া নানককে মধুর ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। নানকের অতুল আনন্দ হইল।

নানকের পিতা পুত্রের এই দানে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি এই জন্য নানককে শাস্তি দিয়াছিলেন।

নানক এখন আর ছেলে মানুষ নহেন। তাঁহার বয়স বিশ বছর হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি বাড়িতেছিল। পিতার একান্ত চেষ্টায়ও তাহার মন সংসারের দিকে গেল না। তিনি সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগের সহিত মিশিতেই ভালবাসিতেন।

আর একবার তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে একটি সোনার অঙ্গুরীয়ক ও একটি পানপাত্র দান করেন। পুত্রের এই দানের কথা পিতার কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

কালু তালবণ্ডী গ্রামের ভূস্বামী রায় বুলারের অনুগত কর্ম্মচারী। বুলার নানককে পরম সাধু জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তিনি এই সময়ে নানককে তাঁহার একমাত্র ভগিনী নানকীর নিকটে সুলতানপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ভগ্নিপতি জয়রাম নবাব দৌলত খাঁ লোদির কমিশরিয়েট্ সংক্রান্ত মুদিখানার কর্ত্তা ছিলেন। কিছু কাল নানক এই মুদিখানায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন সাধুসেবাতেই তাহা ব্যয় করিতেন।

কিছুতেই নানকের মন সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না দেখিয়া পিতা কালু এই সময়ে সুলখনা চৌনী নাম্নী একটি বালিকার সহিত নানকের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কিছুকাল নানক মাতা সুলখনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

কালুর মনোরথ সিদ্ধ হইল না। বিবাহ করায় নানকের মনের গতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে আরও কিছুকাল মুদিখানার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা ঈশ্বরের দরবার হইতে নানকের আহ্বান আসিল। একটি ঘটনায় তিনি তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বুঝিয়া ফেলিলেন।

একদিন বাবা নানক তাঁহার মুদিখানায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে নানককে বলিলেন—"ভগবান্ আপনাকে অতি মহৎ কার্য্যের ভার দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। আপনার নাম 'নানক

নিরঙ্কারী' আপনি নিরাকার পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, না মুদিখানার কার্য্যে জীবন পাত করিবেন ?"

সন্ন্যাসীর কথাগুলি নানকের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিল; তিনি সেই শুভ মুহূর্ত্তে ভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুদিখানার কার্য্য শেষ হইল। উল্লিখিত প্রকারে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বাবা নানক ৩২ বছর বয়সে ফকির হইলেন।

নবাব দৌলত খাঁ লোদি ও নানকের আত্মীয়েরা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। নানক কাহারও বারণ শুনিলেন না; তিনি পত্নী সুলখনা, চারিবৎসরবয়স্ক পুত্র শ্রীচাঁদ, সদ্যোজাত পুত্র লক্ষ্মীদাস, পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনদিগকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

নানকের চরিত্রের একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল। তিনি সকলকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। চাকর বালসিন্ধু (ভাইবালা) তাঁহার সঙ্গ লইলেন। পিতা কালু নানকের গৃহত্যাগের খবর পাইয়া মর্দ্দানা মিরাসীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মর্দ্দানা নানককে ধরিতে যাইয়া নিজেই তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। নানকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সংসারত্যাগী হইলেন। মর্দ্দানা সুগায়ক ছিলেন। নানক যে সকল শ্লোক ও শব্দ রচনা করিতেন তিনি রবাব যন্ত্রসহকারে সেইগুলি গান করিতেন।

নানক ফকিরের বেশে দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। নানা বিসংবাদী ধর্ম্মমতের মধ্যে কোন্ মত লোকে অবলম্বন করিবে, কোন্ পথ শ্রেয়ঃ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে এবং সিংহল, মক্কা, পারস্য, কাবুল প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করেন।

নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা দিয়া ঘুমাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া মন্দিরের

প্রধান মুল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে জাগাইয়া বলিলেন—"তুমি কেমন বেয়াদব ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছ?" নানক উত্তর করিলেন—"হে মুল্লা আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। তুমি বলিতেছ, ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের দিকে পা প্রসারিত করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। আচ্ছা, বল দেখি কোন্ দিকে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নাই? তাহা হইলে সেই দিকে আমার পা দু'খানি ফিরাইয়া রাখিব।" মুল্লা নানকের বাক্যের কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মোগলসম্রাট্ বাবরের সঙ্গেও নানকের একবার দেখা হইয়াছিল। সম্রাট্ নানকের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিস্তর পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, নানক তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন দণ্ড কিংবা পুরস্কার আমি তাঁহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিব, আর কাহারো নিকট হইতে চাইনা।"

বাবা নানক ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসাহের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশ্বময় তিনি ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শত শত শ্লোকে ও শব্দে তিনি তাঁহার অনুভূত আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্মের আরতি রচনা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই,—"হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জি, গগনরূপ থালে রবি চন্দ্র প্রদীপ স্বরূপ হইয়াছে, এবং তারকামণ্ডল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে, বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দসকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ একটিও নয়ন নাই, সহস্র মূর্ত্তি অথচ একটিও

মূর্ত্তি নাই, সহস্র বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই অথচ সহস্র তোমার গন্ধ, এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র।

সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহা তাঁহারই জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করেন, তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাঁহারই জন্য তৃষিত। নানকচাতককে কৃপাবারি প্রদান কর, সে যেন তোমার নামে নিত্য বাস করিতে পারে।"

রসস্বরূপের অনুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে পরমভক্ত নানকের হৃদয় প্রেমে সরস হইয়া গিয়াছিল। সরল শিশুর মত তিনি কোমল-হৃদয় ছিলেন। এইরূপ প্রকাশ, দেশভ্রমণকালে রাস্তায় শিশুদের সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া শিশু হইয়া যাইতেন, তাহাদের খেলাধূলায় যোগদান করিতেন।

সন্ন্যাসীর বেশে নানক যখন প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন তখন একদিন বিপাশানদীর তীরে ক্রোড়ীরা নামক এক ধনি-সন্তানের সহিত তাঁহার দেখা হয়। নানকের অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া ক্রোড়ীরা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। ক্রোড়ীরা বিপাশা তীরে নানককে একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নানকের আদেশ অনুসারে ক্রোড়ীরা ঐ নগরটীর নাম "কর্ত্তারপুর" রাখিয়াছিলেন। ঐ নগরটি শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র হইয়াছে। "সাহাজাদ" অর্থাৎ নানকের বংশ এখনো এখানে বাস করিতেছেন।

নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নানক স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার গৃহী হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন—"কোরাণে পুরাণে ও শাস্ত্রে ভগবান্ নাই; ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতারা

ঐ সকল শাস্ত্রে আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন; শাস্ত্রসমূহ ভ্রমে পরিপূর্ণ, ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া অনাবশ্যক। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ভগবান্ মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছেন। পর্ব্বত-গহ্বর-নিবাসী কঠোর যোগী ও রাজপ্রাসাদ নিবাসী ধনবান্ দুইই তাঁহার চক্ষে তুল্য। কে কি জাতি ভগবান্ কখন তাহার সন্ধান লইবেন না, সংসারে আসিয়া কে কি করিলেন তাহাই তিনি দেখিবেন।" মোটামুটি হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও মূর্ত্তিপূজা এবং মুসলমানদিগের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গুরু নানক কোরাণ ও বেদ ভ্রমপূর্ণ বলিলেও কোনটা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। মুসলমানদিগের পর-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও গোহত্যার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বোগদাদ নগরে অবস্থানকালে তিনি এক দিন মুসলমানদের ডাক-নমাজের মন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একই ক্ষেত্রে উপাসনার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তথাকার মসজিদের প্রধান মুল্লার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তিনি মুল্লাকে বলিয়াছিলেন—"ভূলোকে, দ্যুলোকে যিনি নিত্যকাল বিরাজিত, একমাত্র সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে আমি স্বীকার করি—কোনো সম্প্রদায়ের দেবতাকে স্বীকার করি না।"

নানকের একটি উক্তিতে তাঁহার ধর্ম্মমতের উচ্চতা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন :—"লক্ষ লক্ষ মহম্মদ, কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু, সহস্র সহস্র রাম সেই মহান্ পর ব্রহ্মের মন্দিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদের সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর। সকলেই তাঁহার গুণগান করেন বটে, কিন্তু আপন আপন

মত লইয়া বিরোধ করিতে লজ্জা অনুভব করেন না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহারা অসদ্‌বুদ্ধির দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন। তিনিই প্রকৃত হিন্দু যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত মুসলমান যিনি পবিত্র।"

বাবা নানকের সার্ব্বভৌমিক সাধনা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিল। "ভগবান এক, মানুষ ভাই ভাই" এই সত্যটিই তিনি প্রচার করিতেন। তিনি নিজেকে মৃত্যুশীল, পাপী মানব বলিয়াই মনে করিতেন। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের প্রতি বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন। আদি গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"মানুষ বেদ ও কোরাণ পাঠ করিয়া সাময়িক আনন্দ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ না করিলে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।" কোনো অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড দেখাইয়া তিনি কদাচ কাহাকেও ভুলাইতেন না। কেহ তাঁহাকে অলৌকিক কিছু দেখাইতে বলিলে তিনি বলিতেন—"আমি কেবলমাত্র পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছু জানি না। একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব অস্থায়ী।"

শেষ জীবনে বাবা নানক সপরিবারে বিপাশা নদীর তীরে কর্ত্তারপুরে বাস করিতেন। তখন নানা স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, মধুর বচন ও সরল সৌজন্য সকলকে মোহিত করিত। তিনি হিন্দুকে উপদেশ দিবার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন, কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া মুসলমানদিগকে উপদেশ দিতেন। এইরূপ ভক্তসমাগমে নানকের বাসভূমি কর্ত্তারপুর পরম তীর্থ হইয়া উঠিল—দলে দলে লোক আসিয়া তথায় পুণ্য ও শান্তি লাভ করিত।

নানকের সহচর ভক্তদিগের মধ্যে মর্দ্দানা ও বালসিন্ধুর কথা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। তুঙ্গ গ্রামের রামদাস নামক এক রাখালও তাঁহার সহচর ছিলেন। নানকের আশ্চর্য্য শক্তিতে ও ভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার চির অনুগত হইয়াছিলেন। রামদাস বয়সে অতিশয় প্রাচীন ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে 'বুড্ডা' বলিয়া ডাকিত।

নানকের সহচরদিগের মধ্যে লহিনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধা ভক্তিতে ও ধর্ম্মপ্রাণতায় তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া নানক তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। পরলোকগমনের পূর্ব্বে তিনি লহিনাকে "গুরু অঙ্গদ" নাম দিয়া দ্বিতীয় গুরুর পদে বরণ করিয়া গিয়াছিলেন।

লহিনা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে কাংগ্রায় বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার সময়ে তিনি পথিমধ্যে গুরু নানককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। গুরু নানকের সুমধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাত্মা নানক দীর্ঘকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ১৫৩৯ খৃঃ আশ্বিন মাসের দশমীর দিনে মানবলীলা সংবরণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শিখধর্ম্মের ব্যাপ্তি

গুরু অঙ্গদ

১৫৩৯—৫২

গুরু নানক লহিনাকে ভাবী গুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন। লহিনা ছায়ার ন্যায় গুরুর সঙ্গী ছিলেন। আপনার দেহ মন প্রাণ

গুরুর পায় বিকাইয়া দিয়া তাঁহার সেবক হইয়াছিলেন। পুত্র শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস পিতার যে কঠোর আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইতেন, লহিনা সেই আয়াস-সাধ্য আদেশগুলি প্রসন্নচিত্তে পালন করিতেন। নানক শিষ্যদের গুরুভক্তির দৃঢ়তাপরীক্ষার জন্য কখনো কখনো ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। লহিনা গুরুর সেই সকল উৎপীড়ন অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। তাঁহার অনুরাগ, বিনয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দর্শনে বাবা নানক বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে আপনা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহার নাম অঙ্গদ রাখিয়াছিলেন।

গুরুভক্ত অঙ্গদকে শিখেরা বাবা নানকের তুল্যই ভক্তি করিত। তিনি নানকের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শিখ-ধর্ম্মের প্রচারকল্পে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপাশা নদীর তীরে খড়ুর নামক গ্রামে তিনি বাস করিতেন।

গুরু নানক তাঁহার পুত্র শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাসকে অতিক্রম করিয়া লহিনাকে শিখসমাজের গুরুপদ প্রদান করায় শ্রীচাঁদ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ‘উদাসী-শিখ’ সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

নানকের সহচর বালসিন্ধু গুরু অঙ্গদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে নানকের চরিত-কথা শুনিয়া গুরু অঙ্গদ জন্মসাক্ষীগ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি গুরুমুখী ভাষার অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই গুরুমুখী ভাষাতেই সমস্ত শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। গুরু অঙ্গদের মধুর উপদেশগুলি গ্রন্থসাহেবের দ্বিতীয় শব্দ-মহল্লা বলিয়া খ্যাত।

মহাত্মা নানক গুরুপদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতম শিষ্যকে প্রদান

করিয়া গিয়াছিলেন। গুরু অঙ্গদও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপনার অযোগ্য পুত্রদিগকে গুরুপদে বরণ না করিয়া অমরদাস নামক জনৈক ভক্তকে উক্ত পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

গুরু অমরদাস

১৫৫২—৭৪

দ্বিতীয় গুরুর পরলোক গমনের পরে অমরদাস শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অতীব ন্যায়নিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে ২২ জন প্রধান শিষ্যকে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জন্মস্থান গোবিন্দওয়াল গ্রামে বাস করিতেন।

গুরু অমরদাস অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিখধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায় দিন দিন শিষ্যসংখ্যা বাড়িতেছিল। তিনি যখন পঞ্চনদ প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন উদারহৃদয় আকবর দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে, অমরদাসের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহার মুখে শিখ-ধর্ম্ম-কথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গুরু অমরের মুখে এই নব ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

গুরু অমরদাস পরম ক্ষমাশীল ছিলেন, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রেমের দ্বারা অপ্রেম জয় করিবার উপদেশ দিতেন। মুসলমানেরা এই সময়ে শিখদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গুরুর

আদেশে শিষ্যেরা অম্লান বদনে ঐ অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। একবার দুইবার করিয়া বহুবার উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। শিষ্যেরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত দিন আমরা এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিব?" গুরু উত্তর করিলেন, —"আজীবন যদি তোমাদের প্রতি ঐরূপ দারুণ অত্যাচার চলিতে থাকে তথাপি চিরকাল সহ্য করিবে, কখনো প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে না।"

বাবা নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ উদাসী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা শিখ বলিয়া পরিচিত ছিল। নানক স্বীয় পুত্রকে অযোগ্য বলিয়া তাঁহাকে আপনার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা করেন নাই। বাবা নানকের মতে ধর্ম্মার্থীর সংসার-ত্যাগী হওয়া অনাবশ্যক। উদাসী সম্প্রদায় গৃহত্যাগী। নানকের ধর্ম্মের সহিত শ্রীচাঁদের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরোধ থাকিলেও উভয় সম্প্রদায় একই ধর্ম্মের দুইটি শাখার ন্যায় চলিতেছিল। গুরু অঙ্গদ শ্রীচাঁদকে গুরুপুত্র বলিয়া সম্মান করিতেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীচাঁদের 'উদাসী' দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন নাই। তৃতীয় গুরু অমর দাস প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন যে 'উদাসী' এবং 'শিখ' এক নহে, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে তিনি নবজাত শিখধর্ম্মকে একটি বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

গুরু অমরদাস তাঁহার কন্যাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। রামদাস নামক এক ক্ষত্রিয় জাঠযুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। রামদাস শ্রদ্ধা ও বিনয়ে গুরু অমরদাসের ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শিখধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে গুরু তাঁহার কন্যার অনুরোধে জামাতাকে শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করেন। গুরুপদ এই সময় হইতে বংশানুগত হইল।

স্বর্ণ-মন্দির—অমৃতসর

গুরু রামদাস

১৫৭৪—৮১

গুরু রামদাস অত্যন্ত বিনয়ী ও ভক্ত ছিলেন। মোগল সম্রাট্ মহামতি আকবর লাহোরে অবস্থানকালে, রামদাসের সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তিনি রামদাসকে একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তাকার ভূমিখণ্ড 'রামদাসচক্র' নামে খ্যাত ছিল।

রামদাস সম্রাটের প্রদত্ত এই ভূখণ্ডে 'অমৃত সরোবর' নামক একটি সরোবর খনন এবং সরোবরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে পুণ্যভূমি অমৃতসরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরু রামদাসের শিষ্যেরা সেই সরোবরের তীরে বাস করিত। গুরুও গোবিন্দওয়াল হইতে আসিয়া সময়ে সময়ে সেখানে বাস করিতেন। অমৃতসর তখন 'রামদাসপুর' নামে খ্যাত ছিল। গুরু রামদাসের উপর সম্রাট্ আকবরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন পাঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তখন গোবিন্দওয়ালের নিকট অপেক্ষা করিয়া রামদাসকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি রামদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ ও সমুচিত শ্রদ্ধা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"তাঁহার কোনও প্রার্থনা আছে কি না।" গুরু রামদাস বলিয়াছিলেন,—"আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, এতকাল সম্রাটের দরবার এখানে ছিল, কৃষকেরা বহুমূল্য শস্য বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতেছিল, সম্রাট্ চলিয়া গেলে শস্যের মূল্য সহসা কমিয়া যাওয়ায় প্রজাদের কষ্ট হইবে। আমার অনুরোধ এই যে,—আপনি তাহাদিগকে বর্ত্তমান সনের রাজস্ব মাপ করুন।" সম্রাট গুরুর

এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রার্থনা শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রজাদের রাজস্ব মাপ করিলেন এবং গুরুকেও বহুমূল্য বিবিধ উপহার প্রদান করিয়া সম্মান দেখাইলেন।

উল্লিখিত রূপে রামদাস দিল্লীশ্বরের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক জমিদারও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

গুরু রামদাসের তিনপুত্র। জ্যেষ্ঠ মহাদেব ফকির হইয়া যান, দ্বিতীয় পৃথ্বীদাস ঘোর সংসারী ছিলেন, তৃতীয় অর্জ্জুন চরিত্রগুণে পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামদাস তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুনকে গুরুপদ প্রদান করেন ১৫৮১ খৃঃ রামদাসের মৃত্যু হয়।

গুরু অর্জ্জুন

১৫৮১—১৬০৬

পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন খুব কীর্ত্তিশালী ছিলেন। মহাত্মা নানকের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণ তেমন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নানক ধর্ম্মকে জীবনের ও সমাজের সকল অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে উপদেশ দিতেন; গুরু অর্জ্জুন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

তিনি গুরু হইয়াই অমৃতসর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল হইলেন। তাঁহারই প্রযত্নে এই সময়ে মন্দির ও সরোবরের অসম্পূর্ণাংশ সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি সশিষ্যে অমৃতসরে বাস করিতেন। রামদাসের সেই

অমৃত সরোবর ও মন্দিরটির চারিদিকে একটি জনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী নগর গড়িয়া উঠিল। অমৃতসর শিখধর্ম্মের পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এই নগরটি যেমন ধর্ম্মপ্রাণ শিখদিগের নিকট পবিত্রতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল, তেমনই জনবহুল ও বাণিজ্যপ্রধান বলিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের মিলনভূমি হইয়া উঠিল।

এতকাল গুরুগণ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেন সংসার ও ধর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে একটি রেখা টানিয়া রাখিতেন। অর্জ্জুন নিজ জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদের প্রণালী অতিক্রম করিয়া তিনি কেবল গুরুর নহেন, কিয়ৎ-পরিমাণে রাজার স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক অনুরক্ত অনুচর দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি শিখ-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষীণভাবে একটি ভাবী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইল।

শিখসমাজের কল্যাণকল্পে অর্জ্জুন মাতৃভাষায় শিখধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। আদিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি একমাত্র শিখ-সম্প্রদায়ের কেন, সমস্ত মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অনেক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি শ্লোক ও শব্দ রচনা করিয়া সেই গুলি গুরু নানকের নামে চালাইয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছিলেন। সাধারণের রচিত শ্লোকাদি হইতে গুরুদের রচনা পৃথক্ করিবার নিমিত্ত গুরু অর্জ্জুন এই শ্রমসাধ্য কাজ করিয়াছিলেন। শিখ-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গুরু নানকের রচনা আদি গ্রন্থের প্রথম মহল্লা, দ্বিতীয় গুরুর রচনা দ্বিতীয় মহল্লা, তৃতীয় গুরুর রচনা তৃতীয় মহল্লা, চতুর্থ গুরুর রচনা চতুর্থ মহল্লা ও গুরু অর্জ্জুনের রচনা পঞ্চম মহল্লা বলিয়া উক্ত হয়। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুর ও দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের উপদেশও

অতঃপর আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। গুরুদিগের উপদেশ ভিন্ন কবীর, নামদেব, রামানন্দ, জয়দেব, মীরাবাই, সেখ ফরিদ, ত্রিলোচন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ঊনিশজন প্রসিদ্ধ ভক্তের উপদেশ আদিগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে।

গুরু অর্জ্জুনের সঙ্কলিত আদিগ্রন্থ বেদ পুরাণের স্থান অধিকার করিল।

এই সময় হইতেই অমৃতসরের মন্দিরে নিত্য পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রত্যহ দলে দলে লোক অমৃতসরোবরে স্নান করিতে আসিত, তার-যন্ত্র-যোগে সমস্ত দিন আদি গ্রন্থ হইতে শব্দগুলি গান করা হইত। তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

এতদিন গুরুরা শিখদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। গুরু অর্জ্জুন শিখদের উপর একটি কর স্থাপন করিলেন। এই ধর্ম্ম-কর আদায়ের নিমিত্ত জেলায় জেলায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। গুরুর কর্ম্মচারীরা বৎসরান্তে এই কর তাঁহাকে প্রদান করিতেন। এই নিমিত্ত বর্ষশেষে অমৃতসর নগরে একটি মহাসভার অধিবেশন হইত। এইরূপে ক্রমশঃ শিখ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একটি ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হইতে চলিল। শিখেরা দলভুক্ত হইয়া নিজেদের শক্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। গুরু অর্জ্জুনের অধিনায়কতায় জাঠ কৃষকদিগের মধ্যে বাবা নানকের প্রচারিত ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

গুরু অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্যদিগকে লাভজনক ব্যবসায় গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার অনেক শিষ্য অশ্ববিক্রয়-ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিল।

অর্জ্জুন অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তজ্জন্য অনেকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। শত্রুরা

মোগলসম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলেন, তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খস্রুকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। শিখ গ্রন্থকারেরা বলেন, লাহোরের রাজস্ব-সচিব চন্দসাহ ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া গুরু অর্জ্জুনকে অকারণে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই চক্রান্তে অবশেষে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। লাহোর জেলে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের মৃত্যুসম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; অপর কেহ কেহ বলেন, মোগল সম্রাটের নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীদের পাশবিক অত্যাচারেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আপনার শিষ্যদিগকে এই শেষ বাক্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"ভগবান্ দুর্ব্বলের বল, তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি অবিনশ্বর।"

গুরু অর্জ্জুনের মৃত্যুতে সমস্ত শিখ সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অসিহস্তে ধর্ম্মরক্ষা করিবার কল্পনা এই সময়ে প্রথম তাহাদিগের মনে উদিত হয়। শিখইতিহাসের এই একটি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের যুগ। মুসলমানদিগের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে যে শিখেরা সমরকুশল জাতি হইয়া উঠিবে, তাহারা এই প্রথম তীব্র আঘাত পাইল। ধর্ম্মপ্রাণ শিখ সম্প্রদায়ের মৃদুমন্দ জীবনস্রোত সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিতে চলিল।

হরগোবিন্দ

১৬০৬-৪৫

অর্জ্জুনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ ষষ্ঠ গুরুর পদ লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স এগার বৎসরের বেশি ছিল না। হরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠতাত পৃথীচাঁদ গুরুপদ-লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছিল। হরগোবিন্দ তাঁহার পিতার ন্যায় তেজস্বী ও নির্ভীক ছিলেন। সহচরগণের উত্তেজনায় তিনি মোগল সম্রাটের নিকট তাঁহার পিতার নির্দ্দোষত্ব সপ্রমাণ করিলেন। মোগল সম্রাট্ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া হরগোবিন্দের পিতৃবৈরী চান্দসাহকে গুরুর হস্তে বিচারার্থ প্রদান করিলেন। হরগোবিন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগেরন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ ও ক্ষমাশীল ছিলেন না। পিতৃবৈরীকে স্বহস্তে পাইয়া তিনি বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা সংবরণ করিতে পারিলেন না। অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তিনি চান্দকে হত্যা করিয়াছিলেন।

অপরিণতবয়স্ক হরগোবিন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগের প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে রণমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। শিখধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক অহিংসাপরায়ণ ও নিরামিষাশী ছিলেন। হরগোবিন্দ মৃগয়াতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন এবং মৃগয়ালব্ধ মাংস ভোজন করিতেন। অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি শারীরিকবল-সম্পন্ন বলিয়া তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদের ধর্ম্মপ্রাণতা যে সম্প্রদায়কে জীবন দান করিয়াছিল অর্জ্জুনের শোচনীয় মৃত্যু ও হরগোবিন্দের যুদ্ধানুরাগ সেই সম্প্রদায়কে যুদ্ধনিপুণ করিয়া তুলিল। তাঁহার শিষ্যগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে গুরুর

আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিতে লাগিল। ষাট জন অস্ত্রধারী রক্ষী তাঁহার দেহরক্ষকের কার্য্য করিত। তিনশত অশ্বারোহী সর্ব্বদা তাঁহার আদেশপালনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিত।

গুরু হরগোবিন্দ মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অনুচর হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইলেন। ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গুরুভক্ত শিখেরা গোয়ালিয়রে সমবেত হইল। তাহারা দুর্গের দ্বারদেশে নতজানু হইয়া গুরুর মুক্তি প্রার্থনা করিত। শিখদের বিস্ময়কর গুরু-ভক্তি দর্শনে সম্রাট্ প্রীত হইয়া হরগোবিন্দকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরগোবিন্দ দ্বাদশ বৎসর বন্দী ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া দ্বিতীয়বার তিনি মোগলসম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা কারণে পুনর্ব্বার সম্রাটের বিষ-নয়নে পতিত হওয়ায় তিনি পলায়ন করিয়া অমৃতসরে আসিয়াছিলেন। হরগোবিন্দের এক শিষ্য তুর্কিস্থান হইতে গুরুর নিমিত্ত কয়েকটি মূল্যবান্ অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। মোগলসম্রাটের অনুচরেরা বলপূর্ব্বক অশ্ব কয়েকটি কাড়িয়া লইয়াছিল। লাহোরের মুসলমান বিচারকর্ত্তা দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উহাদের একটি অশ্ব উপহার পাইয়াছিলেন। হরগোবিন্দ ক্রয়ের ভান করিয়া সেই অশ্বটি লইয়া যান। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া হরগোবিন্দের সহিত মোগলসম্রাটের বিরোধ উপস্থিত হয়।

মোগলসম্রাটের প্রেরিত সৈন্যদিগকে তিনি তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে লোক শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হরগোবিন্দ কখন কখন স্বেচ্ছায় মুসলমানদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি অনেকবার

বিপন্নও হইয়াছিলেন, কিন্তু সহচরগণের বিশ্বস্ততা তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। ধর্ম্মজীবনে উন্নত না হইলেও তিনি অনুচর ও শিষ্যদিগের অতীব শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৬৪৫ খৃঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইল।

একজন রাজপুত শিখ গুরুর চিতায় জীবন দান করিয়া তাঁহার উৎকট গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; আরো অনেক শিষ্য পূর্ব্বোক্তরূপ অনাবশ্যক জীবনপাতের নিমিত্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল। গুরু হর রায়ের নিষেধে তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে হরগোবিন্দ তাঁহার পৌত্র (পরলোকগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র) হর রায়কে গুরুপদে বরণ করিয়া যান। হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চারি পুত্রই তখন জীবিত ছিল। তেগ্‌বাহাদুর ব্যতীত অপর তিন জন গুরুপদ পাইবার জন্য বিবাদ করিতেছিলেন বলিয়া হরগোবিন্দ পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া পৌত্রকে গুরুপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

হর রায়

১৬৪৫—৬১

হরগোবিন্দ শতদ্রুতীরবর্ত্তী কর্ত্তারপুরে দেহত্যাগ করেন। নূতন গুরু কিছুদিন সেখানে বাস করেন। গুরু হররায় অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। পঞ্চনদ-দেশের কোন কোন শিখপরিবার এখনও গুরু হররায়ের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। হররায়ের শাসনকাল অতি শান্তিতেই কাটিয়া গিয়াছিল।

১৬৫৮—৯ খৃঃ অব্দে যখন সম্রাট্ সাজাহানের পুত্রেরা পৈতৃক সিংহাসন লইয়া কলহে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন গুরু হররায় দারার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধে দারা পরাজিত হইলেন। বিজয়ী আরংজীব হররায় ও তাঁহার পুত্রকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করেন। পুত্রকে জামিন রাখিয়া হররায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাশ, আরংজীব হররায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামরায়কে উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া অল্পদিন মধ্যে মুক্তি দিয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃঃ হররায় কর্ত্তারপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণকে গুরুপদে বরণ করেন। এই সময়ে তাহার বয়স ছয় বৎসরমাত্র।

হরকিষণ

১৬৬১—৬৪

হরকিষণ গুরুপদ লাভ করিলেন, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরায় উক্ত পদের দাবী কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। তিনি দাসীর গর্ভজাত পুত্র হইয়াও গুরুপদ লাভের আশায় বিবাদ চালাইতে লাগিলেন। বিবাদের কোন মীমাংসাই হইতেছে না দেখিয়া উভয় পক্ষ সম্রাট্ আরংজীবকে মধ্যস্থ মান্য করেন। সম্রাট্ দুইজনকে দিল্লীনগরে আহ্বান করিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে সম্রাট্ আরংজীব শিশু হরকিষণের বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকেই গুরুপদ দিয়াছিলেন। শিশু বাদসাহের বেগমদিগের মহলে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বেগমদিগের মধ্য হইতে প্রধানা মহিলাকে বাছিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

বিরোধের মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিশু গুরু আর দেশে ফিরিলেন না। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এইমাত্র বলিয়া গেলেন—"বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী গোবিন্দওয়ালের অনতিদূরে বকালা গ্রামে আমার পিতার আত্মীয়েরা বাস করেন, ঐ গ্রাম হইতে নবম গুরু নিযুক্ত হইবেন।"

তেগ বাহাদুর

১৬৬৪-৭৫

হরকিষণের মৃত্যুকালের উক্তি প্রচারিত হইয়া পড়িলে বকালার সোড়িবংশীয় অনেকেই গুরুপদলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নিষ্ঠাবান্ ও বিরাগী তেগবাহাদুর কিছুকালের নিমিত্ত নীরব রহিলেন। এদিকে রামরায়ও গুরুপদ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিখই ধর্ম্মশীল তেগবাহাদুরকে গুরুপদে বরণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইল। তেগবাহাদুর এযাবৎকাল সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন; তিনি গুরুপদের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন,—"পিতার তরবারি ধারণের ক্ষমতা আমার নাই, আপনারা অন্য কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করুন। আমি 'তেগবাহাদুর' অর্থাৎ সুনিপুণ অসিচালক নহি, আমি 'দেগবাহাদুর' অর্থাৎ দরিদ্রের অন্ন-দাতা।" এই সময় দিল্লী হইতে মুখুন সা নামক হরগোবিন্দের এক প্রধান শিষ্য বকালে আগমন করেন। তিনি তেগবাহাদুরকেই প্রণামী দিয়া গুরু বলিয়া অভিবাদন করেন। বহুসংখ্যক শিখের ও জননীর আদেশে তেগবাহাদুরকেই গুরুপদ গ্রহণ করিতে হইল।

বকালার সোড়িশিখেরা অভিলষিত পদলাভ করিতে না পারিয়া গুরু তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। গুরু তথা হইতে কর্ত্তারপুরের নিকটবর্ত্তী মাখোয়াল গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি এইখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মাখোয়াল এই সময় হইতে আনন্দপুর নামে খ্যাত হইল।

ধর্ম্মপ্রাণ তেগবাহাদুরের অনুরক্ত শিষ্যের সংখ্যা কম ছিল না, ভীষণ শত্রুরও অভাব ছিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। পার্থিব সুখভোগে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াও তিনি বিদ্রোহী বলিয়া সম্রাট্ আরংজীবের বিষনয়নে পতিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি এই সময়ে ঘোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ধার্ম্মিক তেগবাহাদুর স্বচক্ষে শিষ্যদের ভীষণ দুর্গতি দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইতেন। জীবনপাত করিয়াও তিনি ধর্ম্মের গৌরব রক্ষানিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

একদিন গুরু তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের মুখে শিখদিগের দুর্দ্দশাকাহিনী শ্রবণ করিয়া অধীর হইয়া উঠেন। তিনি তখন সম্মিলিত শিষ্যদিগকে বলিলেন,—"অত্যাচারের হাত হইতে স্বজাতীয়দিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তোমরা তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী উৎসর্গ কর।" গুরুর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র গোবিন্দ বলিয়া উঠিলেন—"শিখেরা আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করে।" তেগবাহাদুর পুত্রের বাক্যে প্রীত হইলেন এবং স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় আত্মোৎসর্গের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

প্রবল মোগল-রাজশক্তির ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তেগবাহাদুর শিখধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও রাম রায়ের চক্রান্ত অচিরে তাঁহাকে বিপন্ন করিল। বিদ্রোহী

বলিয়া তিনি দিল্লীনগরে আহূত হইলেন। সম্রাট্ আরংজীব তাঁহাকে শাস্তিপ্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় তিনি সে বার অব্যাহতি লাভ করেন। মহারাজ দিল্লী-শ্বরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শিখগুরু একজন বিষয়-বিরাগী মহাপুরুষ, রাজশক্তি-লাভের নিমিত্ত তিনি লালায়িত নহেন। তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন।

জয়পুরের মহারাজ গুরু তেগবাহাদুরের ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। তিনি এই সময়ে গুরুকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশে গমন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা কিছুকাল পাটনা নগরে বাস করিয়াছিলেন। গুরু এই সময়ে বঙ্গদেশ ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, কামরূপের রাজা গুরুর মুখে শিখধর্ম্মমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুর বাসস্থানে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ধুবড়ী নগরে ঐ ধর্ম্মশালা এখনও দৃষ্ট হয়।

কিছুকাল পরে গুরু আবার পঞ্চনদপ্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চিরশত্রু রাম রায়ের প্ররোচনায় তিনি পুনর্ব্বার বিপন্ন হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ তেগ বাহাদুরের বিরুদ্ধে ডাকাতি, অন্যায্যকরস্থাপন প্রভৃতি নানা অভিযোগ আরোপিত হইল। এবারে দিল্লীশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শিখ গুরু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন।

তেগ বাহাদুর স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ যাত্রা আর তাঁহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লীযাত্রার পূর্ব্বে তিনি আপনার বীরপুত্র গোবিন্দের হস্তে পিতা হরগোবিন্দের তরবারি প্রদান করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন এবং বলিলেন—"প্রাণপণে এই তরবারির সম্মান রক্ষা করিও।

মৃত্যুর অভিসম্পাত বহন করিয়া আমি দিল্লী নগরে যাইতেছি। সেখানে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমার মৃতদেহ যেন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়। আর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হইও না।”

প্রহরি-বেষ্টিত শিখগুরু যথাসময়ে দিল্লীশ্বর আরংজীবের সমীপে নীত হইলেন। শিখলেখকদের গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, এই সময়ে সম্রাট্ আরংজীব তেগ বাহাদুরকে নানা উপায়ে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনে তাঁহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলিয়াছিলেন—“পৃথিবীর সকলে মুসলমান হইবে ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত সংসারে রাখিয়াছেন কেন?” গুরুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“তোমার এমন কি অলৌকিক বিদ্যা জানা আছে, যাহার প্রভাবে তুমি একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নায়ক হইতে চাও; তোমার সেই অলৌকিক বিদ্যার পরিচয় প্রদান কর কিংবা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হও। এই দুইটির কোন প্রস্তাবে সম্মত না হইলে ঘাতকের তরবারি তোমার শির ছিন্ন করিবে।” রোষদীপ্ত দিল্লীশ্বরের সিংহাসনসম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীক তেগ্ বাহাদুর অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন—“ভগবানের আরাধনাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; আমার কোন অলৌকিক শক্তি দেখাইবার ইচ্ছা নাই। তথাপি আপনার অনুরোধে আমি এক কার্য্য করিব, আমার গলদেশে মন্ত্রপূত একখণ্ড কাগজ বাঁধা থাকিবে, আমার মৃত্যুর পরে তাহা অলৌকিক কার্য্য সাধন করিবে।”

এই বলিয়া গুরু আপনার কণ্ঠে কাগজখণ্ড বাঁধিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় গ্রীবা অবনত করিয়া দিলেন। সম্রাটের ইঙ্গিতে ঘাতক

তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। কৌতূহলী সম্রাট্ রক্ত-রঞ্জিত কাগজখণ্ড ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। উহাতে লেখা ছিল—"শির দিয়া শির নে দিয়া।" "মাথা দিলাম কিন্তু বিশ্বাস ত্যাগ করিলাম না।"

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে তেজস্বী তেগ বাহাদুর উল্লিখিতরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে প্রকাশ—দিল্লী নগরের কারাগৃহে অবস্থানকালে গুরু স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে অচিরে সম্রাটের আদেশে তাঁহার মুণ্ড দেহচ্যুত হইবে, তখন তিনি মুসলমানের হস্ত হইতে মৃত্যুদণ্ড-গ্রহণের লাঞ্ছনা এড়াইবার নিমিত্ত এক বন্দী শিখকে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করেন! গুরুর সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া উক্ত শিখ তাঁহার নির্দ্দয় আদেশ পালন করিয়াছিল।

শিখধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তেগ বাহাদুর আপনার জীবন দান করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা ও বীরত্ব শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব শক্তি সঞ্চারিত করিল। গুরুর নৃশংস হত্যার কথা শুনিয়াও দলে দলে লোক শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়কে বলশালী করিয়া তুলিল। সত্য সত্যই তেগ বাহাদুরের শেষোক্তি—"শির দিয়া শির নে দিয়া"—তাঁহার মৃত্যুর পরে অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ
ও
খালসা সমাজ প্রতিষ্ঠা

১৬৭৫-১৭০৮

ধর্ম্মবীর তেগ বাহাদুর যখন মোগল সম্রাটের আদেশে ঘাতকের হস্তে নিহত হন, তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দ পঞ্চদশবর্ষীয় যুবক। পিতার নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনিতে পাইয়া কিশোরবয়স্ক গোবিন্দ শোকে আত্মহারা হইলেন। পিতার শেষ বাণী স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার মৃতদেহ উদ্ধার ও নৃশংস হত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। প্রহরি-বেষ্টিত দিল্লী নগর হইতে কেমন করিয়া পিতার দেহ উদ্ধার করিবেন তাহা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার অল্পসংখ্যক অনুচরদের নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। এক নিম্ন-শ্রেণীর শিখ মৃতগুরুর দেহ উদ্ধার করিয়া আনিতে প্রতিশ্রুত হইল। সুখন সা নামক এক সমৃদ্ধ বণিকের সহায়তায় সে এই দুরূহ কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিল।

তিনি এখন আপনার অসাধারণ ধর্ম্মবল, গভীর পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় বীরত্ব লইয়া নির্ভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, বৈরাগ্য ও স্বার্থহীনতা শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিল। শিখেরা তাঁহাকে আপনাদের নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইল। অতি অল্পসংখ্যক শিখ রামরায়ের অনুগত রহিল। একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত হইতে হয়, মহাত্মা গুরুগোবিন্দ সেই সমুদায় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতৃবৈরী ধর্ম্মান্ধ মোগলদিগের প্রতি তিনি বিদ্বেষপরায়ণ হইলেও তাঁহার হৃদয় উদার ছিল। তিনি একদেশদর্শী ছিলেন না। সংকীর্ণ সংস্কার দ্বারা তিনি কখনো পরিচালিত হইতেন না। মোগল-রাজশক্তি যখন শিখধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতেছিল, ভগবানের ইঙ্গিতে ঠিক সেই সংঘর্ষের সময়ে গুরুগোবিন্দ কঠোর সাধনা শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অধর্ম্ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিবামাত্র বিচ্ছিন্ন শিখেরা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। ‘গুরুর জীবনে জীবন লাভ’ করিয়া সকলেই জাগিয়া উঠিল। গুরুর স্পর্শে শিষ্যদের হৃদয়ে বিস্ময়কর ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্বলিত হইল। তাহারা প্রাণ হইতেও প্রিয় ধর্ম্মরক্ষার জন্য জপের মালা ও লাঙ্গল ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল। মোগলশাসনের উচ্ছেদসাধন ভিন্ন স্বধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া শিখেরা মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক জাতিভেদ স্বীকার করিতে না, তথাপি শিখসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব এড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। উচ্চবর্ণের শিখেরাই সম্প্রদায়ে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত জাতিগত পার্থক্য এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টিকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল

পাহুল বা দীক্ষা দান

গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্য হইতে এই কৃত্রিম ব্যবধান দূর করিবার নিমিত্ত ঘোষণা করিলেন। "সকল শিখই সমান, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই শিখ হইবার অধিকার আছে। জাতির অভিমান ভুলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে একপাত্রে ভোজন কর। ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া যাইয়া 'খালসা' অর্থাৎ খোলাসা না হইতে পারিলে কহারও পরিত্রাণলাভ হইবে না।"

শিষ্যদিগকে 'খালসা' করিবার নিমিত্ত তিনি 'পাহুল' নামক প্রাচীন দীক্ষাগ্রহণ-প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আহ্বানে একদিন শিষ্যেরা সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগকে একটি বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্র আনিতে আদেশ করিলেন। পাত্র আনা হইলে তিনি তাহার অভ্যন্তরের জল স্বীয় তরবারি দ্বারা আলোড়ন করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে ঐসময়ে গোবিন্দের পত্নী সেইখান দিয়া পঞ্চবিধ মিষ্টদ্রব্য লইয়া যাইতেছিলেন। গুরুগোবিন্দ উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমাদের এই দীক্ষাভূমিতে নারীজাতির আগমন অতি শুভজনক; ভগবান্ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, বৃক্ষ যেমন অসংখ্য পত্রে ভূষিত হয়, খালসা সম্প্রদায় তেমনি অসংখ্য সন্তান লাভ করিবে।" গুরু তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে পঞ্চবিধ মিষ্ট চাহিয়া লইয়া সেগুলি জলের সহিত মিশ্রিত করিলেন। পবিত্র সরবৎ প্রস্তুত হইল। তিনি তাঁহার প্রধান পাঁচজন শিষ্যকে উহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিতে দিলেন, কিঞ্চিৎ তাহাদের মাথায় ছড়াইয়া দিলেন। সুস্নাত-শুচি শিষ্যেরা গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—'ওয়া গুরুজী কি ফতে।' দীক্ষিত পঞ্চশিষ্যের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, আর অপর তিনজন নিম্নশ্রেণীর শূদ্র। গুরু তাঁহার নবদীক্ষিত খালসা শিষ্যদিগকে 'সিংহ' উপাধিতে

পঞ্চম অধ্যায়

শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ

ও

খালসাসমাজ-প্রতিষ্ঠা [২]

জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দ্বারা কোনোকালে খালসা সম্প্রদায় দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, এই উদ্দেশ্যে গোবিন্দ তাঁহার শিষ্য-দিগকে বলিলেন— "তোমারা উপবীত ধারণ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে জাতিগত ও ব্যবসায়গত প্রভেদ থাকিবে না।" খালসা শিষ্যেরা গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর গুরু গোবিন্দ নিজে শিষ্যদের হস্ত হইতে সরবৎ পান করিয়া স্বয়ং 'খালসা' হইলেন। এই সময় হইতে গুরু গোবিন্দ 'সিংহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি উপস্থিত শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গুরু হইতে খালসার এবং খালসা হইতে গুরুর উৎপত্তি হইল। অদ্য হইতে গুরু খালসাকে এবং খালসা গুরুকে রক্ষা করি-বেন।" গুরুর আদেশক্রমে প্রধান শিষ্য পাঁচজন, সমবেত অপর শিখ-দিগকে দীক্ষা দান করিলেন।

গুরু গোবিন্দ যে ধর্ম্ম-মত প্রচার করিলেন তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। তিনি মহাত্মা নানকের ন্যায় মানবজাতির স্বাভাবিক অধিকারের সুদৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াইয়া সকলকে সাম্যে ও ভ্রাতৃবন্ধনে বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন। শিষ্যদিগকে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—

"তোমাদের মন, আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস সমান হউক। তোমরা সকলে তুল্য, কেহ উচ্চ কেহ নীচ নহ। হিন্দুদের ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিও না, তীর্থ ভ্রমণ হইতে বিরত হও, হিন্দু-দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইও না। একমাত্র গুরু নানককে শ্রদ্ধা দেখাইবে। আজ অবধি তোমাদের মধ্য হইতে জাতিভেদ চলিয়া গেল। পাহুল তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে।"

গোবিন্দসিংহের উদার আহ্বান জাঠ কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এতদিন যাহারা নীচবর্ণ বলিয়া শিখ-সম্প্রদায়ে স্থান পায় নাই, গুরু তাহাদিগকে খালসা করিয়া লইলেন। হিমালয়পর্ব্বতে সাধনসময়ে তিনি যে চিত্র কল্পনায় আঁকিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে গোবিন্দসিংহ তাহা সত্যে পরিণত করিলেন। তিনি এখন সত্য সত্যই বলিতে পারেন :——

"সিন্ধুমাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল,—
আহ্বান শুনে' কে কারে থামায়,
ভক্ত-হৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদকোলাহল।
*　*　*　*
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে' যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।"

গুরু গোবিন্দ সিংহের সংস্কারকার্য্যে অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিখ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

গুরু ঐ সকল জাত্যভিমানীদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। তিনি পতিতকে টানিয়া তুলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে এতকালের অস্পৃশ্য শিখেরা অমৃতসরের মন্দিরে প্রবেশ ও সরোবরে স্নান করিবার অধিকার পাইল। অল্পসংখ্যক বৃথাভিমানী দাম্ভিক গুরুকে ছাড়িয়া গেল, কিন্তু সহস্র সহস্র নীচবর্ণের ব্যক্তি উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই শিখ হইবার অধিকার পাইল! 'পাহুল' শব্দের মূল অর্থ দরজা ; গুরু গোবিন্দ তাঁহার সর্ব্ববর্ণের শিষ্যদিগকে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের দ্বারে উপনীত করিলেন।

গুরু গোবিন্দ তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কেবল ধর্ম্মবলের নহে, বাহু-বলের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এই কারণে খালসাদিগকে যুদ্ধানুরাগী করিয়া তুলিবার নিমিত্তই তিনি তাহাদিগকে বীরত্বব্যঞ্জক 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক খালসা-শিখকে কৃপাণ, কড় অর্থাৎ লৌহবলয় 'কচ্ছ' বা ছোট পায়জামা, 'কঙ্গি' বা চিরুণি ও কেশ সাম্প্রদায়িক চিহ্নস্বরূপ ধারণ করিতে হইবে। শিষ্যদিগকে যুদ্ধ-মদে মাতাইয়া তুলিবার নিমিত্তই তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দের মতে, সেই প্রকৃত শিখ, যে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। তিনি ভীরুতাকে নিকৃষ্টতম পাপ এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাহস-প্রদর্শনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বীরহৃদয় গোবিন্দ সিংহ তরবারিকে গভীর শ্রদ্ধা দেখাইতেন। তিনি তাঁহার হস্ত-স্থিত তরবারিকে সম্বোধন করিয়া

বলিতেন— "হে পবিত্র তরবারি, আমি পরম শ্রদ্ধাসহকারে তোমাকে প্রণাম করি।"

গোবিন্দ যখন তাঁহার খালসা শিষ্যদের লইয়া প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি ভক্তিনম্র মনে বলিতেন,—"হে জগদীশ্বর, তুমি দয়া করিয়া এই করিও, আমি যেন কখনো মঙ্গলব্রত-সাধনে দ্বিধা না করি, আমি যখন জয়লাভে সংকল্প করিয়া রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তখন যেন কিছুতেই শত্রুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু যখন আমার নিকটবর্ত্তী হইবে তখন আমি যেন বীরের মত মরিতে পারি। হে ঈশ্বর, জীবনে-মরণে তুমিই আমার প্রভু হইও।"

দূরদর্শী গুরু গোবিন্দ জানিতেন যে, অচিরেই তাঁহাকে প্রবল মোগল-রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি আপনাকে সৈন্য-বলে বলী করিবার নিমিত্ত ঘোষণা করিলেন যে, যে শিখ-পরিবারে চারিজন পরিণতবয়স্ক পুরুষ আছে সেই পরিবারের দুইজনকে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পর দেখিতে দেখিতে গুরুর অধীন সৈন্যের সংখ্যা আশী সহস্র হইল। * জাতিকুলের অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্চ নীচ, হিন্দু মুসলমান সকলে আসিয়া গুরু গোবিন্দের পতাকা-মূলে মিলিত হইল।

খালসা সম্প্রদায় একতার আশ্চর্য্যশক্তি অবিলম্বে অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা সমরকুশল বীর্য্যশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। নূতন খালসারা প্রত্যেকেই খালসা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। গুরু গোবিন্দের আহ্বানে সহস্র সহস্র হীনজাতীয় ব্যক্তি খালসা হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিল।

গুরু গোবিন্দ তাঁহার অধীন সৈন্যদিগকে কিঞ্চিৎ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা

* সার গর্ডনের মতে আশী সহস্র; কিন্তু ম্যাগ্রেগর বলেন বিশ সহস্র।

দিয়া, তাহাদিগকে কতকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী সর্দ্দার শিষ্যেরা এই দলগুলির নেতা হইলেন। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দ সিংহের খালসা সৈন্যদলে অনেক পাঠান যোগদান করিয়াছিল। শিখগুরু ভারতবর্ষে নানা স্থান হইতে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বলশালী করিয়া তুলিতেছিলেন। যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী দুর্গম গিরিপ্রদেশে গোবিন্দ কয়েকটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। আনন্দপুর এবং চামকৌড়েও সেনা-সন্নিবেশের ব্যবস্থা হইল।

গুরু গোবিন্দের খ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য পার্শ্ববর্ত্তী কোনো কোনো পার্ব্বত্য রাজার ঈর্ষার উদ্রেক করিল। তাঁহার পুরাতন বন্ধু নাহনের রাজাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। হিণ্ডুর রাজা কোনো সামান্য কারণে গোবিন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি নাহন রাজের সহিত যোগদান করিলেন। গুরুর অধীন একদল পাঠানসৈন্যও বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। উভয়পক্ষে একটি ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে গোবিন্দ জয়লাভ করেন। নলগড়ের বিদ্রোহী রাজা তাঁহার হস্তে নিহত হন।

অল্পকালমধ্যে গুরু গোবিন্দের অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আনন্দপুরের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশের উপর তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আনন্দপুর দুর্গ অধিকতর সুরক্ষিত করা হইল।

এই সময়ে পার্ব্বত্য রাজারা মোগলরাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত একদল মোগল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। গোবিন্দ সসৈন্যে পার্ব্বত্য রাজাদিগকে রক্ষা করিতে চলিলেন। মোগল-রাজশক্তির ভয়ে ভীত হইয়া দুইজন পার্ব্বত্যনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলদের পক্ষ

সমর্থন করিলেন। তথাপি গোবিন্দ বিজয়ী হইলেন। পরাজিত মোগলসৈন্যেরা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

বিজয়ী গোবিন্দ সিংহের অধিকার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাখোয়াল হইতে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী রুপুর পর্য্যন্ত ভূভাগের তিনি অধিকারী হইলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজারা শক্তিশালী গোবিন্দ সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া একপত্রে সম্রাট্ আরংজীবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, গুরু গোবিন্দ তাঁহাদের অধিকৃত কতকগুলি স্থান বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, অতএব তাঁহার আক্রমণ হইতে সম্রাট্ অধীন রাজাদিগকে রক্ষা করুন।

গুরুগোবিন্দ পার্ব্বত্যরাজাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আরংজীব পূর্ব্বেই গুরু গোবিন্দকে উপযুক্ত শাস্তি-প্রদানের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মোগল সৈন্যকেও শিখগুরু পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে পার্ব্বত্য রাজাদের পত্র পাইয়া সম্রাটের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি লাহোরে ও সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃদ্বয়কে অবিলম্বে গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, সম্রাটের পুত্র বাহাদুর সাহও সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবার গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে বিরাটবাহিনী সজ্জিত হইয়াছে। লাহোর ও সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তারা অসংখ্য সৈন্যসহ পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রাজারাও আপন আপন সৈন্যসহ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সমবেত সৈন্যদল আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। গোবিন্দ সিংহ মাখোয়াল দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ ভীষণ আক্রমণেও তিনি হতোদ্যম হইলেন না। দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে সাত মাস কাল যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াও এবার কিছুতেই

জয়লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুচরেরা ভীত হইয়া দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। গুরু গোবিন্দ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সুগঠিত দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু তথায়ও খাদ্যের অনাটন হইল। ক্রমে সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, কেবলমাত্র চল্লিশ জন বিশ্বাসী ভক্ত গুরুর সহিত মৃত্যুও শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল না।

বিপদ যখন ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন গুরু গোবিন্দ সম্মুখসংগ্রামে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বৃদ্ধা জননী গুজ্‌রি, ফতেসিং ও জরওয়ার সিংহ নামক দুইটি শিশুপুত্রকে গোপনে সিরহিন্দে পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহারা মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তা ওয়াজির খাঁ গোবিন্দের শিশুপুত্রদ্বয়কে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বীরশিশুরা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"দেখ, তোমরা বালক, তোমাদের সহিত আমাদের কোনো বিরোধ থাকিতে পারে না, তোমরা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর মুক্তি পাইবে এবং ভবিষ্যতে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।" বালক-দ্বয় শাসন-কর্ত্তার প্রস্তাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল। একদিন শিশুদ্বয় দরবার-গৃহে বসিয়া আছে, এমন সময়ে শাসনকর্ত্তা সস্নেহে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎসগণ, আমি যদি তোমাদিগকে মুক্তি দান করি, তোমরা কি করিবে।" তাহারা ধীরভাবে উত্তর করিল—"আমরা অবিলম্বে শিখসৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে নিহত করিব।" বিস্মিত হইয়া শাসনকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা যুদ্ধে যদি তোমাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে কি করিবে?" বীরশিশুদ্বয় নির্ভয়ে বলিয়া

উঠিল—"কেন, পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সম্মুখযুদ্ধে হয় আমরা মরিব, নতুবা আপনাকে মারিব।" বালকদ্বয়ের গর্ব্বিত উত্তরে শাসনকর্ত্তার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, তোমরা যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তো এখনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ জীবিত অবস্থাতেই এখনই তোমাদিগকে কবরস্থ করা হইবে।" বিশ্বাসী বালকেরা বিন্দুমাত্র ভীত হইল না। তাহাদের কিশোর মুখমণ্ডল ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত হইল। তাহারা উত্তর করিল—"আমরা গোবিন্দ সিংহের পুত্র মৃত্যু-ভয়ে ভীত নহি। মৃত্যু-ভয়ে কখনো ধর্ম্মত্যাগ করিব না।"

বালকদ্বয়ের মুখে উক্ত তেজোময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ওয়াজির খাঁ ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বালকদ্বয়কে নগর প্রাচীর মধ্যে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। তাহারা শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটল থাকিয়া অতি ধীরভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। পৌত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া অসহ্যশোকে গোবিন্দ সিংহের জননী গুজ্‌রি প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহাবীর গোবিন্দ সিংহ জননী ও পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। এই বিষম বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিনি স্বজাতীয়দিগের দৈন্য দূর করিবার ভাবী সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সুযোগে তিনি তাঁহার ভক্ত অনুচর চল্লিশ জনের সহিত মাখোয়াল দুর্গ ত্যাগ করিয়া চামকৌড় দুর্গে গমন করেন। এই একটিমাত্র দুর্গই তাঁহার অধিকারে ছিল। মোগলেরা এই দুর্গও অবরোধ করিল। মুসলমান শাসনকর্ত্তা গুরুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান হইলে তাঁহার কোনো ভয় নাই।

গুরুর তেজস্বীপুত্র অজিতসিংহ সংবাদবাহক মোগল-দূতকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অসহায় গুরু গোবিন্দ মৃত্যুর জন্য

প্রস্তুত হইলেন এবং তিনি তাঁহার পত্নী, পুত্রদ্বয় ও অনুচর চল্লিশজনকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য, তোমরা বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি জীবিত থাকিলে তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিশ্চিত গ্রহণ করা হইবে।"

অতঃপর গুরু তাঁহার অল্প কয়েকটি অনুচর সহ বীরের ন্যায় অগণ্য মোগলবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমক্ষে তদীয় পত্নী ও পুত্রদ্বয় নিহত হইলেন। অনুচরেরাও একে একে রণক্ষেত্রে শয়ন করিল। তিনি ও তাঁহার পাঁচ জন অনুচর কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। পলায়নকালে গুরু গোবিন্দ দুইজন পাঠানের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। এই দুইজন পাঠান ইতিপূর্ব্বে বিপৎকালে গুরুর নিকট করুণ ব্যবহার পাইয়াছিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাহারা গুরুকে বেহ্লালপুর জনপদে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছাইয়া দিল। তিনি এখানে কাজি মীর মহম্মদ নামক এক মৌলবীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দ এই মৌলবীর নিকট পূর্ব্বে কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। বেহ্লালপুর হইতে তিনি ভুটিণ্ডার অরণ্যপ্রদেশে গমন করেন। গুরু গোবিন্দের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল, নানা দিক হইতে শিখেরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গুরুর অনুচর সংখ্যা আবার দ্বাদশ সহস্র হইয়া উঠিল। কঠোর সংগ্রাম ও বিপদরাশি উত্তীর্ণ হইয়া আবার তিনি সুদিন পাইলেন। জনক জননী পত্নী ও পুত্রদিগের শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার বাসনা প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার বুকে ধক্ ধক্ করিতেছিল। উৎপীড়কগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তিনি স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। বল-

গর্ব্বিত আরংজীবকে তিনি এক পত্রে জানাইলেন—"আমি চড়ুই পাখীদ্বারা বাজ পক্ষীর বিনাশ সাধন করিব; আপনি সতর্ক হউন।" সম্রাট্‌ শিখদিগের পুনরভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইলেন। এদিকে সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বার সাত সহস্র (৭০০০) সৈন্যসহ গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবারে মুসলমান পক্ষ হইতে শিখপক্ষে সৈন্যবল অধিক ছিল। গুরু অনুচরগণ সহ অতর্কিত ভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। বহুসংখ্যক শিখ ও মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। মুসলমানেরা পরাজিত হইল। গুরু গোবিন্দের বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে দলে দলে শিখ আসিয়া তাঁহার জনবল বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। তিনি আবার পূর্ব্ববৎ বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। মোগলরাজশক্তি গুরু গোবিন্দকে দমন করিতে অকৃতকার্য্য হইল।

যে পবিত্র ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক শিখ আপনাদের জীবন দান করিয়া স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা 'মুক্তসর' নামে খ্যাত। মুক্তসরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগলেরা আর গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে নাই। বিজয়ী গুরু দীর্ঘকাল পরে অবসর পাইয়া গ্রন্থপ্রণয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে গ্রন্থসাহেবের দশম খণ্ড ও বিচিত্র নাটক রচিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া মোগল সম্রাট্‌ আরংজীব গুরু গোবিন্দের অসাধারণ বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরধর্ম্মবিদ্বেষী সম্রাট্‌ শত্রুরূপে গোবিন্দ সিংহ ও খালসা সম্প্রদায়ের দমনে অকৃতকার্য্য হইয়া গুরুর সহিত সৌহার্দ্দ্যস্থাপনে অভিলাষী হইলেন। তিনি তাঁহার সমীপে একজন দূত পাঠাইলেন। গুরু সম্রাটের সহিত দেখা করিবার জন্য আহূত হইলেন। গোবিন্দ সম্রাটের সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান

করিয়া তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। গুরু পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চৌদ্দশত পারসী শ্লোকে পত্রটি লিখিত হইয়াছিল। তীব্র ভাষায় তিনি সম্রাটকে জানাইয়াছিলেন যে,—সম্রাট্ ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা অকারণে গুরুর পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রদিগকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়া তাঁহাকে গৃহহীন, সহায়হীন ও পরিজনহীন করিয়াছিলেন; তিনি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও পরিশেষে জয়যুক্ত হইয়াছেন; মোগলদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত নহেন। মানুষকে তিনি ভয় করেন না এবং তিনি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করা হইবে।

গুরু গোবিন্দ সম্রাটকে জানাইলেন যে, এই পত্র কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, ইহা পাঠ করিয়া যদি তাঁহার গুরুর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হয়, গুরু সম্রাট্-সমীপে গমন করিবেন।

আরংজীব এই পত্র পাঠ করিয়া বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। কেহ কেহ বলেন, মোগল-সম্রাট বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি এতকাল গুরুর বিরুদ্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, গুরু গোবিন্দ নিরীহ ফকির মাত্র।

সম্রাট্ স্বীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য দুঃখিত হইয়া আবার গোবিন্দ-সিংহকে তাঁহার দরবারে আহ্বান করিলেন। এবার গুরু আর কোনো আপত্তি প্রকাশ করিলেন না।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে পথিমধ্যেই তিনি সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেন। নূতন সম্রাট্ বাহাদুর সাহ অবিলম্বে গুরুকে সাদর আহ্বান জানাইলেন। গুরু নূতন সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

সম্রাট্ বাহাদুরসাহ পৈতৃক সিংহাসন লইয়া ভ্রাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি জাঠদলপতি তেজস্বী গুরুগোবিন্দকে বিবিধ মূল্যবান্ উপহার দান করিলেন এবং যথোচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে গোদাবরীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শিখগুরুর প্রতি নূতন সম্রাট্ কি কারণে এমন অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন, বলা দুরূহ। হয়তো বা মনে করিয়াছিলেন যে, এই দুর্দ্দমনীয় শিখবীরের সহায়তায় তিনি প্রতাপশালী মারাঠাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবেন। সম্রাট্ গুরু গোবিন্দকে পাঁচ সহস্র সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিখগুরু মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে কিছুকাল শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য ও বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণ আবার আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ইহার পর একবার তিনি পঞ্জাবে আগমন করিয়াছিলেন। এবারে তাঁহার সমস্ত শিষ্য আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। অল্পদিন-মধ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন। তথায় বন্দানামক এক সাহসী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য ও অনুচর হইল।

গুরু গোবিন্দ যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক পাঠান অশ্বব্যবসায়ীর নিকট হইতে তিনি কতকগুলি অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। একদিন ঐ অশ্ববিক্রেতা গুরুর নিকট তাহার ঘোড়ার মূল্য চাহিল। গোবিন্দসিংহ তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। তাহাতে পাঠান অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিল। গুরুগোবিন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করেন। পর মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মকৃত এই নৃশংস কার্য্যের নিমিত্ত নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারই যত্নে পাঠানের মৃতদেহ যথারীতি সমাহিত হইল। মৃত পাঠানের পরিজনবর্গ প্রকাশ্যে কোন প্রতিহিংসাগ্রহণের ভাব দেখাইল না। কিন্তু তাহার দুই পুত্র পিতার শোচনীয় মৃত্যুর

প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপ প্রকাশ, একদিন রাত্রিকালে গোপনে গুরু গোবিন্দের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহারা নিদ্রিত গুরুর বক্ষে ছোরা বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিহত করে। আহত হইবামাত্র গুরু গোবিন্দ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন এবং হত্যাকারীরা ধরা পড়িয়াছিল। পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া মৃত্যুকালে গুরু গোবিন্দ প্রতিহিংসাপরায়ণ পাঠান যুবকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তিনি যুবকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—" তোমরাই পিতার যোগ্যপুত্র ; তোমাদের জীবন সার্থক ; তোমরা পিতৃহত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়াছ ; আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। তোমরা নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া যাও।"

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুসম্বন্ধে সাধারণে আর একরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহাতে প্রকাশ পিতৃহীন যুবকদ্বয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বয়ং যুবকদ্বয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। একদা যুবকেরা দাবাখেলায় যখন আত্মহারা তখন কৌশলে গুরু তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন এবং তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া স্বীয় অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ নিঃসন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুশয্যায় শোকমুগ্ধ শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার অবর্ত্তমানে কে আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, আমরা কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব, কে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করিবেন ?" গুরু তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—"তোমরা হতোদ্যম হইও না, একে

একে দশজন গুরুকর্তৃক পবিত্র সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, গুরুদের কার্য্য শেষ হইয়াছে—আমি অবিনশ্বর পরব্রহ্মের হস্তে খালসাসম্প্রদায় সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। যদি কেহ গুরুর দর্শন পাইতে চাহে তাহাকে গ্রন্থ-সাহেব অনুসন্ধান করিতে হইবে, গুরু খালসাসম্প্রদায়ের সহিত নিত্যকাল বাস করিবেন; তোমাদের বিশ্বাস অটল হউক, যেখানে পাঁচজন বিশ্বাসী শিখ মিলিত হইবে, সেখানেই গুরুর আবির্ভাব হইবে, জানিও।”

পুণ্য-সলিলা গোদাবরী নদীর*তীরে নাদের নামক স্থানে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে গুরু গোবিন্দ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার আদেশ মতে শিষ্যেরা নববস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ গুরুকে দগ্ধ করিয়াছিল।

গুরু গোবিন্দ যে মহান্ অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং যে বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা ও আয়োজন অপূর্ণ রহিয়া গেল। তথাপি তাঁহার জীবন ব্যর্থ হয় নাই। তিনি শিখসম্প্রদায়কে নবজীবন দান করিয়াছিলেন তিনি পুরাতন শিখধর্ম্মের সংস্কার করিয়া তাহাকে নূতন আকার দান করিয়াছিলেন এবং সম্প্রদায়ের পরিচালনার নিমিত্ত নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুণ্যময় জীবনে যে অদম্য অধ্যবসায়, অসীম সহিষ্ণুতা ও অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া আজপর্য্যন্ত প্রত্যেক শিখ তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অতুলনীয় প্রতিভাবলে তিনি পতিত জাঠদিগকে টানিয়া তুলিয়া একটা শক্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেমন ধর্ম্মপ্রাণ তেমনই যুদ্ধবিশারদ

ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাকে ভগবান্ অতি উপযুক্ত সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া আপনাকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই শিখ-সম্প্রদায়কে যুদ্ধবিদ্যায় দীক্ষিত করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম্ম এই বাহুবলকে সংযত রাখিয়াছিল; দুঃখের বিষয়, গুরুর আসন শূন্য হইবামাত্র বাহুবল ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়াছিল। এই সময়ে শিখদের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের সূচনা হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে তাহারা বিচ্যুত হইল। জাতিভেদের নিগড় ভাঙ্গিয়া দিয়া গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন। নবপ্রচারিত শিখধর্ম্মের বিনাশসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মান্ধ মোগলেরা যেমন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল তাহাতে নানকের প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে বাহুবলের যোগ সাধন না করিলে শিখেরা টিঁকিয়া থাকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। প্রতিভাশালী গুরু গোবিন্দ বুদ্ধিবলে শিখধর্ম্মকে এই নূতন শক্তি দান করিয়াছিলেন। শিখদিগকে বীরমদে উন্মত্ত করিবার জন্য গোবিন্দ একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি মুক্তিলাভের উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সমাজ-গ্রন্থি ভেদ করিয়া পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করিয়া কি উপায়ে অস্ত্রবলে স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, এই পুস্তকে গুরু তাহার আলোচনা করিয়াছেন। 'গুরুমঠ' বা শিখদের জাতীয় মহাসভা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় সমস্ত শিখ আপন আপন রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করিতে পারিত।

অশিক্ষিত জাঠকৃষকদিগকে তিনি সুকৌশলে সুগঠিত শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবলে ও অস্ত্রবলে বলী করিয়া তিনি অশিক্ষিত জাঠদিগের প্রাণে জাতীয় ঐক্যমন্ত্র জাগাইয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ খালসাসম্প্রদায় স্থাপন করিয়া তিনি যে জাতির গৌরবমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন, মোগল-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইবার পরে মহারাজ রণজিত সিংহ স্বাধীনতা দান করিয়া সেই জাতির গৌরবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দা

১৭০৮-১৬

এইরূপ প্রকাশ, গুরুগোবিন্দ যখন গোদাবরীপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি শিষ্যদিগের মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, নিকটবর্ত্তী কোনো পল্লীতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জনৈক হিন্দু বৈরাগী বাস করেন, ঐ বৈরাগীর বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কেহ উপবেশন করিলে মন্ত্রবলে তিনি তাহাকে ভূমিশায়িত করিতে পারেন। কৌতূহলী গোবিন্দ সশিষ্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। বৈরাগীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বৈরাগী তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গোবিন্দকে ভূতলশায়ী করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মন্ত্র ব্যর্থ হইলে তিনি শিখগুরুকে অসামান্য শক্তিশালী মহাত্মা মনে করিয়া তাঁহার পদমূলে পতিত হইলেন। শ্রদ্ধানম্রচিত্তে তিনি গুরুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি অভিপ্রায়ে এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন, সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" গুরু উত্তর করিলেন—"আমার প্রার্থনা, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।" বন্দা প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন—"আমি আজ হইতে আপনার বন্দা অর্থাৎ দাস হইলাম।"

এই দিন হইতে বন্দা শিখ-গুরু গোবিন্দের অনুচর হইলেন। বন্দার বীরত্ব গোবিন্দকে মোহিত করিয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এই বীরশিষ্যকে নিজসমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার সম্প্রদায়ের চালক হইবে। তুমি বিখ্যাত যোদ্ধা হইবে। আমি আমার পিতা পিতামহ ও পুত্রগণের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া যাইতে পারিলাম না, তোমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি মৃত্যুভয়ে কদাচ ভীত হইও না।"

এই বলিয়া গুরু স্বীয় তূণীর হইতে পাঁচটি শর লইয়া সেই শর কয়টি শিষ্যের হস্তে প্রদান করিয়া আবার বলিলেন—"আমার এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, যতদিন তোমার চরিত্র নির্ম্মল থাকিবে, ততদিন আমার আশীর্ব্বাদে বিপদ্ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। আমার আদেশ অমান্য করিলে অকালে তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।"

গুরুগোবিন্দের মৃত্যুর পরে তাহার সহচর শিখেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহারা অনেকেই অসি ছাড়িয়া আবার লাঙ্গল ধরিল। পঞ্চনদপ্রদেশের শিখেরা গুরুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বন্দাকে তাহাদের নায়ক করিবার নিমিত্ত উৎসাহী হইল এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত একদল শিখ দাক্ষিণাত্যে গমন করিল।

গুরুদত্ত শর পাঁচটি বিজয়ের প্রতিভূস্বরূপ সঙ্গে লইয়া বন্দা পঞ্চনদ প্রদেশে চলিলেন। শিখেরা তাঁহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের নায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। গোবিন্দের সুগঠিত সম্প্রদায়ের জনবলে বলী হইয়া বন্দা শত্রুদলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গুরু গোবিন্দের দুই পুত্র সিরহিন্দ নগরের প্রাচীরমধ্যে জীয়ন্ত প্রোথিত হইয়াছিল। বন্দা সর্ব্বপ্রথমে উক্ত নগর ধ্বংস করিতে চলিলেন। মুসলমানেরা বন্দার অসীম প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল শাসনকর্ত্তা পরাজিত ও নিহত হইলেন; নগরী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। বন্দা নির্ব্বিচারে নগরবাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালবৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান্ সকলকে হত্যা করিয়া তাহার উৎকট প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। অতঃপর বন্দা শিরমুর শৈলমালার পাদদেশে লোহগড়নামক একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী রাজ্যাংশ অধিকার করেন।

নূতন সম্রাট্ বাহাদুর সাহ এত দিন সহোদরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছেন এবং শক্তিশালী মারাঠাদিগের সহিতও তিনি কোনো প্রকারে বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আপনাকে কিয়ৎ পরিমাণে নিরাপদ করিয়া যখন রাজপুত-নায়কগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন, তখন সহসা তিনি সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তার হত্যা, নগরীলুণ্ঠন ও অজ্ঞাত-কুলশীল বন্দার বিজয়-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-ব্যাপার শেষ করিয়া দিল্লী যাইবার পথে তিনি এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি দ্রুতগতি পঞ্চনদপ্রদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনানায়কেরা ইতিপূর্ব্বেই একদল শিখকে পানিপথ-ক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া বন্দার নূতন-নির্ম্মিত দুর্গ 'লোহগড়' অবরোধ

করিয়াছিল। জনৈক নব দীক্ষিত শিখবীর আত্মদান করিয়া কৌশলে বন্দা ও তাঁহার অনুচরগণকে অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে পলায়নের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর বন্দা কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লাহোরের নিকটবর্ত্তী জম্বুনামক পার্ব্বত্য জনপদে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পঞ্চনদপ্রদেশের সমৃদ্ধাংশের অধিবাসীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এদিকে বাহাদুর সাহ এতদিনে স্বয়ং লাহোর নগরে উপনীত হইলেন। অত্যল্পকালমধ্যে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৭১২ খৃষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারী)।

মোগলসম্রাটের মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া আবার লড়াই বাধিয়া গেল। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দর সাহ প্রায় একবৎসর কাল আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭১৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকসিয়ারের হস্তে তিনি নিহত হইলেন। মোগলসাম্রাজ্যের এই আত্মদ্রোহের সুযোগ পাইয়া শিখেরা শক্তি-সঞ্চয়ের অবসর পাইল। তাহারা বিপাশা ও ইরাবতী নদীদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশে গুরুদাসপুর নামে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। লাহোরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা বন্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাজিত হইলেন। বিজয়ী বন্দা ক্ষমতায় পঞ্চনদপ্রদেশে অদ্বিতীয় হইয়া উঠি-লেন। একদল শিখসৈন্য আবার সিরহিন্দ আক্রমণ করিতে চলিল। তথাকার শাসনকর্ত্তা বাইজিদ্ খাঁ পথিমধ্যে সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। জনৈক শিখ অতর্কিতভাবে মুসলমান-শিবিরে প্রবেশ করিয়া শাসনকর্ত্তাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। মুসলমানসৈন্যেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল, সিরহিন্দ নগর দ্বিতীয়-বার শিখদের হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইল। কেহ কেহ বলেন,

বন্দা সিরহিন্দ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বন্দার পরাক্রমে মোগল-সম্রাট্ ফেরোকসিয়ার চিন্তিত হইলেন। তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা তুরাণী-সেনা-নায়ক আবদুল সম্মদ খাঁকে পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শিখদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে আদেশ করিলেন। পূর্ব্বদেশ হইতে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইল। আবদুল সম্মদ সমস্ত সৈন্যসহ লাহোরে সমবেত হইয়া তথা হইতে যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। এবার বন্দার বিরুদ্ধে অসংখ্য মোগলবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। তিনি পুনঃপুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন। তেজস্বী বন্দা পরাজিত হইয়াও অদম্য-উদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামে শিখেরা ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িল। বন্দা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। নানাস্থান হইতে তিনি বিতাড়িত হইয়া অবশেষে সসৈন্য গুরুদাসপুর-গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানেও তিনি শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। মুসলমানেরা এমন ভীষণ ভাবে দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিল যে, দুর্গবাসী শিখেরা বাহির হইতে কিছুমাত্র খাদ্য আহরণ করিতে পারিতেছিল না।

বন্দা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। দুর্গমধ্যে যে সামান্য খাদ্য সঞ্চিত ছিল তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্য শিখেরা অশ্ব, গর্দ্দভ এমন কি নিষিদ্ধ ষাঁড়গুলিও হত্যা করিল। ক্রমে তাহাও ফুরাইয়া গেল। এবার বন্দাকে নিরুপায় হইয়া মুসলমানদের হাতে ধরা দিতে হইল। বন্দা ৭০০ শিখসৈন্যসহ বন্দী হইলেন।

বিজয়ী মোগলেরা বন্দীদিগকে লইয়া দিল্লীযাত্রা করিল। নিহত শিখদিগের ছিন্নমুণ্ড বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া রণজয়ী মোগলসৈন্যেরা

খেলিতেছিল। তাহারা বন্দী শিখবীরদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নির্ভীক শিখদিগের হৃদয়ে কিছুতেই ভয়ের সঞ্চার হইল না। কাজির বিচারে প্রতিদিন একশত শিখ ঘাতকের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারাইতে ছিল। তথাপি একজন শিখও মৃত্যুভয়ে ভীত হইল না। সকলেই অগ্রে জীবন দান করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতেছিল। অষ্টম দিনে বন্দাকে বিচারকদের সমক্ষে উপনীত করা হইল। তাঁহার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত। বিচারক বন্দার শিশুপুত্রকে তাঁহার অঙ্কে স্থাপন করিয়া বন্দার হস্তে একখানি ছোরা দিলেন, এবং ঐ ছোরা দ্বারা স্বহস্তে নিজপুত্রকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি নিঃশব্দে অবিচলিত হস্তে পুত্রের বক্ষে ছোরা বসাইয়া দিলেন। হত্যা করিবার পর ঘাতকেরা দগ্ধ-সাঁড়াশী দ্বারা তাঁহার মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। বন্দা একটিবারও কাতরতা প্রকাশ না করিয়া পরম ধৈর্য্য সহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

বৈরাগী বন্দা কোনো দিন শিখসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন নাই। শৌর্য্য বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া কিছুকালের জন্য তিনি সম্প্রদায়ের নেতা হইতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চরিত্রে এমন কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি লোকের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। গুরু গোবিন্দ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-বলহীন ব্যক্তির উপর সম্প্রদায়ের পরিচালন-ভার প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কোনো কোনো ইতিহাসপ্রণেতা গুরু গোবিন্দের এই নির্ব্বাচনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুর পিতৃ-পিতামহ ও পুত্রদের নৃশংস নিধনের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে যাইয়া বন্দা যে বর্ব্বরতার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তিনি

নির্ব্বিচারে বাল বৃদ্ধ ও রমণী সকলকে হত্যা করিয়া পৈশাচিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবীর গুরুগোবিন্দ কখনো এমন প্রতিহিংসা-গ্রহণের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না।

বন্দার ধর্ম্মবিরোধী শৌর্য্য শিখসম্প্রদায়ের কোনো উপকার সাধন করিয়াছে কি না তাহা বিচার্য্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দা কিছুকাল শিখ-দিগের নায়ক ছিলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে কেহ কোনো কালে তাঁহাকে নায়ক বলিয়া সম্মান করে নাই।

বাবা নানক ও গোবিন্দ সিংহের উদারতা তাঁহাতে ছিল না; তিনি তাঁহার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাদের প্রচারিত উদার ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি খাঁটি শিখ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার আচরণ কিয়ৎপরিমাণে গৃহত্যাগী হিন্দু-উদাসীনের তুল্য ছিল। প্রচলিত শিখ ধর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্তনে তিনি যখনই চেষ্টা করিতেন নিষ্ঠাবান্ শিখেরা তখনই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। সাক্ষাৎকারকালে শিখেরা পরস্পরকে—'ওয়া গুরুজী কি ফতে' বলিয়া অভিবাদন করিত। বন্দা ঐ সম্ভাষণ বাক্য বদলাইয়া—'ফতে ধর্ম্ম ফতে দর্শন' বাক্য চালাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। যে ক্ষেত্রে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না সে ক্ষেত্রেও স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া তিনি অপদস্থ হইতেন। এই সব কারণে বন্দা শিখদিগের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, বীরত্বে বন্দা অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার জীবিত-কালে মোগলেরা মাথা তুলিতে পারে নাই। বন্দার মৃত্যুর পরে শিখ-সম্প্রদায়ের উপর ঘোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। বহুসংখ্যক শিখ ধৃত হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল। অল্প বিশ্বাসীরা প্রাণভয়ে ধর্ম্মান্তর

গ্রহণ করিল। মোগল-শাসন-কর্ত্তারা শিখ-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে কেহ কোনো শিখকে বধ করিতে পারিলে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইত। শিখেরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অনেকে হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কেহ কেহ বা সম্প্রদায়ের বিশেষত্বজ্ঞাপক বেণী প্রভৃতি চিহ্ন কাটিয়া ফেলিল। অনুরাগী শিখেরা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শতদ্রু নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইল। কিছুকালের নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে শিখেরা দূরে সরিয়া পড়িল, তাহাদের নামপর্য্যন্তও শোনা যাইত না।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতালাভ

বিচ্ছিন্ন ও পলাতক শিখগণ প্রায় বিশ বছর কাল লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করিতে লাগিল। তাহারা কিয়ৎকালের জন্য নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেও সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল না; বিচ্ছিন্ন-শিখ-শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের ন্যায় রহিয়া গেল। শিখেরা নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে মোগল-সাম্রাজ্য দিন দিন হত-শ্রী হইতেছিল। সম্রাট্ আরংজীবের ধর্ম্মান্ধতা মোগল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেও তিনি

স্বীয় প্রতিভা-বলে নানা বিরোধ, বৈষম্য ও বিদ্রোহের মধ্যে নির্ভীকভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাট-দিগের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাঁহারা নামমাত্র সম্রাট্ ছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ে বাজীরাও দিল্লী আক্রমণ করেন। তাঁহার ভয়ে দিল্লীশ্বর কম্পিত হইয়াছিলেন। অল্প কয়েক বৎসরমধ্যে লক্ষ্ণৌ,হায়দরাবাদ ও বঙ্গদেশে শক্তিশালী মুসলমান নায়কেরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। রোহিলখণ্ডের আফগানেরা এবং ভরত-পুরের জাঠেরাও সদর্পে মাথা তুলিয়া উঠিল। পারস্যের বিজয়ী নায়কেরা দিল্লী নগরে অপরিমিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। মোগল-রাজ-শক্তি ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইল।

ভারতবর্ষের উক্তরূপ অবস্থা শিখদের অভ্যুত্থানের পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। আবদুল সম্মদ খাঁ ও তাঁহার হীনবল বংশধরগণের শাসনকালে শিখেরা শান্তভাবে আপনাদের পল্লীগুলিতে নিরাপদে বাস করিতেছিল। কেহ কেহ অরণ্যে বাস করিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। শিখদের এই সময়কার অবস্থা শোচনীয় হইলেও তাহারা গুরু নানকের মধুর ধর্ম্মকথা, গোবিন্দ সিংহের উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ ও উদারতা বিস্মৃত হয় নাই। তাঁহাদের উপদেশগুলি সাধারণের মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কৃষক ও শিল্পিগণ গোপনে ধর্ম্ম-আলোচনা করিত; তেজস্বী উন্নত শিখদিগের মনে অদূরবর্ত্তী অভ্যুত্থান ও প্রতিহিংসার বাসনা নিরন্তর জ্বলিতেছিল।

নাদীর সাহের ভারত-আক্রমণের সময়ে শিখেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। তখন তাহারা বিজয়ী পারসিক সৈন্যদিগের লুণ্ঠিত ধন এবং নগরবাসী ধনবানদিগের অর্থসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। এইরূপ

ছোটখাটো যুদ্ধে জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া তাহারা বৃহৎ বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের ভয়ে এতদিন তাহারা গোপনে অমৃতসরের মন্দির দর্শন করিতে যাইত। পূর্ব্বোক্ত খণ্ডযুদ্ধগুলিতে জয়লাভের পর তাহাদিগের সাহস বাড়িয়া গেল, এই সময় হইতে শিখেরা প্রকাশ্যে দ্রুতগতি অশ্বারোহণে মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা করিতে যাইত। কেহ কেহ ধৃত হইয়া নিহতও হইত, কিন্তু মৃত্যুভয়ে শিখদিগকে মন্দির-গমনে বাধা দিতে পারে নাই।

জিকারিয়া খাঁয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র খাঁ জাহান এই সময়ে পঞ্চনদ-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একদল শিখ ইরাবতী নদীর তীরে ডুল্লেওয়াল নামক স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি হইতে কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। লাহোরের শাসনকর্ত্তার সৈন্যেরা উক্ত শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল। যুদ্ধে সেনাপতি নিহত হইলেন। মুসলমান পক্ষ হইতে দ্বিতীয় একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। এবার শিখেরা পরাজিত হইল। মুসলমানশাসনকর্ত্তা অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরাজিত শিখদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকটি নৃশংস আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের অধিকাংশ শিখ ধৃত হইয়া বন্দীরূপে লাহোরে আনীত হইল। নগরের যে অংশে এই স্বাধীনতা-পিপাসু শিখদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল, সে স্থান তদবধি (Place of Martyrs) 'সুহিদ গঞ্জ' নামে খ্যাত হইয়াছে। অন্যান্যের সঙ্গে গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রসিদ্ধ ভক্ত-শিষ্য তরুসিংহ বন্দী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি এমন আধ্যাত্মিক বললাভ করিয়াছিলেন যে, যে কোনো পার্থিব অত্যাচার এই ধর্ম্মবীরকে সত্যের পথ হইতে রেখা-মাত্র বিচ্যুত করিতে পারিত না।

এই শিখবীর প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন বাঁচাইতে অনুরুদ্ধ হইলেন। বীরবর তরুসিংহ কোনো ক্রমেই তাঁর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া তখন শাসনকর্ত্তা বলিলেন—"তরুসিংহ সত্বর শিখধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ তোমার বেণী কর্ত্তন করা হইবে।" নির্ভীক তরুসিংহ উত্তর করিলেন—"ভাল তাহাই হউক, বেণীর সহিত মস্তকের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন, আমি বেণী ও মস্তক একসঙ্গে দান করিব।" তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতের চিহ্ন বেণী কাটিতে দিলেন না। "বেণীর সঙ্গে মাথা দিয়া" নির্ভয়-হৃদয়ে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। ভক্ত তরু সিংহের তপ্ত শোণিতে সুহিদগঞ্জের ধরণী-বক্ষ রঞ্জিত হইল।

জিকারিয়া খাঁর মৃত্যুর পরে লাহোরের রাজপ্রতিনিধির পদ লইয়া তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কনিষ্ঠ সাহ নোয়াজ খাঁ (Shah Nuwaz Khan) জ্যেষ্ঠকে তাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদীর সাহ নিহত হইলে আহম্মদ সাহ আবদালী আফগানিস্থানের অধিপতি হইলেন। আফগানরাজের সহায়তা পাইবার আশায় সাহ নোয়াজ খাঁ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। দুরাণীরাজ আবদালী সৈন্য-বল সংগ্রহ করিয়া এতকাল ভারতবর্ষের দিকে লোলুপ-নেত্রে চাহিয়াছিলেন, তিনি লাহোরের শাসনকর্ত্তার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া দ্রুতগতি পঞ্চনদ-প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এদিকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নোয়াজ খাঁর মতি ফিরিয়া গেল, তিনি আবদালীকে মিত্রভাবে অভ্যর্থনা না করিয়া সিন্ধুতীরে তাঁহাকে সসৈন্যে আক্রমণ করেন। দুর্ভাগ্য নোয়াজ পরাজিত হইলেন। আবদালী পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। সিরহিন্দ পর্য্যন্ত তিনি পলায়নপর নোয়াজের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই

খানে নাম-মাত্র মোগল-সম্রাটের উজীরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কয়েকটি খণ্ড ও একটি বৃহৎ যুদ্ধের পর আবদালী পলায়ন করিয়া স্বদেশে চলিলেন। এই সময়ে শিখগণ আফগানরাজকে আক্রমণ করিয়া নিজদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। আবদালীর সহিত যুদ্ধে উজীর এক গোলার আঘাতে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মীর মন্নু (Meer Munoo) যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি উল্‌মুল্‌ক উপাধি ধারণ পূর্ব্বক লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্ত্তা হইলেন। এই সময় হইতে পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনাধিকার লইয়া মোগলে, আফগানে ও শিখে লড়াই চলিতে লাগিল। আপনাদের স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শিখদিগকে প্রথমে মোগল-রাজশক্তি, পরে আফগানরাজশক্তির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিয়ৎকালের নিমিত্ত একবার মারাঠাপ্রভুত্বও সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সময়ে দিল্লীশ্বরের প্রতাপ পূর্ব্ববৎ ছিল না। প্রাদেশিক ক্ষমতা-শালী নায়কেরা সম্রাটের অধীনতার পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন। লাহোরের নূতন শাসনকর্ত্তা যেমন তেজস্বী তেমন উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি আদীনাবেগ ও কোরামল নামক দুইজন সুযোগ্য সহকারীকে সহায় করিয়া পঞ্চনদপ্রদেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

নূতন শাসনকর্ত্তার সহযোগীরা প্রথমে কিছুকাল শিখদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিয়াছিলেন। পঞ্চনদপ্রদেশের শাসনাধিকার লইয়া আমেদসাহের সহিত যখন মোগল-রাজকর্ম্মচারীদিগের লড়াই চলিতেছিল, তখন অবসর পাইয়া শিখেরা অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী রামরাওনিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং জসা সিংহ কুলান

নামক এক নায়কের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। মন্নু শিখদিগের এই অভ্যুত্থান দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার মানসে রামরাওনি দুর্গ আক্রমণ করিলেন। শিখেরা পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিজিত প্রদেশে যখন তিনি শান্তিসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সহসা আফগানেরা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। এক খণ্ড-যুদ্ধে তিনি আফগানরাজকে পরাস্ত করিয়া পঞ্চনদপ্রদেশে প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু অবশেষে আফগানরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন।

লাহোরের মুসলমানশাসনকর্ত্তার সহিত আফগানরাজের যখন উল্লিখিতরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন শিখেরা আস্তে আস্তে বলসঞ্চয় করিয়া আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের শাসন-শৈথিল্য তাহাদের স্বাধীনতালাভের অনুকূলে কার্য্য করিতেছিল।

দুরাণীরাজের স্বদেশে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে উচ্চাভিলাষী মন্নু মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই আদীনাবেগ পঞ্চনদপ্রদেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত স্বাধীন ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। মাখোয়াল উৎসবের সময়ে তিনি একবার উৎসবমত্ত শিখদিগকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শক্রভাবে শিখদিগকে পরাজিত করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইবে মনে করিয়া তিনি পরিশেষে তাহাদের সহিত মিত্রতাস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে অমৃতসর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গিরিপ্রদেশপর্য্যন্ত শিখ-দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মীর মন্নুর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের শাসনাধিকার লইয়া কিছুকাল গোলযোগ চলিয়াছিল। মন্নুর বীর-পত্নী কিছুদিন আপনার শিশু-

পুত্রের নামে শাসনদণ্ড চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। ক্রমে পাঞ্জাব আদীনাবেগের হস্তগত হইল। আমেদ সাহ আবদালী সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি পাঞ্জাব স্বীয় অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার শিশুপুত্র তাইমুর, জেহান খাঁ নামক এক সর্দ্দারের অধীনে, পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। নাজিবুদ্দৌলা আফগানরাজের প্রতিনিধিরূপে দিল্লীশ্বরের দরবারে রহিলেন।

নূতন শাসনকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে শিখশক্তির উচ্ছেদসাধন ও আদীনাবেগকে দলনের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। সূত্রধর জসা নামক এক শিখনায়ক রামরাওনি দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আফগান-শাসনকর্ত্তা উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। শিখেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আফগানদের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দেখিয়া আদীনাবেগ ভীত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া আফগানশাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে শিখদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই শিখেরা জাগিয়া উঠিতেছিল। নবধর্ম্মবলে বলী বীর্য্যবান্ শিখেরা আবার লাহোরে সমবেত হইল। নূতন শাসনকর্ত্তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শিখেরা লাহোর নগরে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল। শিখ-নায়ক জসা সিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মিলিত হইল। মোগলদের টাকশালে তিনি খালসা সম্প্রদায়ের নামে টাকা ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন।

আদীনাবেগ শিখদিগের সহায়তালাভের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। রাজ্যলাভের দুরাশা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল, তিনি এসময়ে শক্তিশালী মারাঠাদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ওদিকে দিল্লীতে দুরাণীরাজের প্রতিনিধি সম্রাটের শক্তি খর্ব্ব করিয়া স্বয়ং যথেচ্ছভাবে

শাসনদণ্ড চালনা করিতেছিলেন। প্রতিনিধি নাজিবুদ্দৌলার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত দিল্লীশ্বরের মন্ত্রী গাজীউদ্দিন মারাঠাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মারাঠা-সেনা দিল্লী ছাইয়া ফেলিল, নাজিবুদ্দৌলা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দিল্লী অধিকার করিয়া মারাঠা-সর্দ্দার রাঘোবা সসৈন্যে আদীনাবেগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত পঞ্চনদ-প্রদেশে চলিলেন। আদীনা একদল শিখ সহ মারাঠাদের সহিত মিলিত হইল। এই সম্মিলিত সৈন্যদলের পরাক্রমে আবদালীর নিযুক্ত সির-হিন্দের শাসনকর্ত্তা বিতাড়িত হইলেন। লুণ্ঠন-লব্ধ-দ্রব্য-বিভাগ লইয়া শিখে ও মারাঠায় বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদে মারাঠারা জয়ী হইল, শিখেরা লাহোর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মুলতান, আটক ও লাহোর মারাঠাদের হস্তগত হইল। পরাজিত আফগানেরা আপনাদের কতকগুলি শিবির তুলিয়া লইল। মারাঠাদের অনুগ্রহে আদীনাবেগ নাম-মাত্রে পঞ্চনদপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। উচ্চাভিলাষী আদীনা আপনাকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, অল্পদিন মধ্যে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আদীনার মৃত্যুতে সমগ্র পাঞ্জাব মারাঠাদের শাসনাধীন হইল; এই সময়ে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে মারাঠাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গাজিউদ্দিনের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা আযোধ্যা-বিজয়ের ও উত্তর ভারত হইতে রোহিলাদিগকে তাড়াইবার আয়োজন করিতেছিল।

সহসা বিজয়-লক্ষ্মী মারাঠাদের প্রতি বিমুখ হইলেন। পঞ্জাব হস্তচ্যুত হওয়ায় আমেদ সাহের ক্রোধের সীমা রহিল না। বিজয়-গর্ব্বিত মারাঠাদের দর্প চূর্ণ করিবার মানসে তিনি বিপুল বাহিনীসহ বেলুচিস্থান হইতে যাত্রা করিলেন। সাহের আগমন

সংবাদ পাইয়া মারাঠারা মুলতান ও লাহোর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পানিপথ ক্ষেত্রে আফগান-মারাঠায় তুমুল সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মারাঠা বীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। দুরাণী-রাজের ভীষণ আক্রমণে মারাঠারা হতবীর্য্য হইলেন। উন্নতিশীল মারাঠাজাতির পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা অন্তর্হিত হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভীষণ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। দুরাণীরাজ যুদ্ধান্তে সিরহিন্দ ও লাহোরে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চনদপ্রদেশের আধিপত্য লইয়া মারাঠাদের সহিত দুরাণীরাজের যখন উল্লিখিতরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, শিখেরা তখন কোনো পক্ষ অবলম্বন করে নাই। দেশের অরাজক অবস্থা তাহাদিগকে বলসঞ্চারের অবসর দিয়াছিল। দুই চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল অলক্ষ্যে পশ্চাৎ বা পার্শ্ব হইতে আফগানসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু দুরাণীরাজ পঞ্চনদপ্রদেশ ত্যাগ করিবার পরেই তাহারা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। বাসগ্রামগুলি তাহাদের করায়ত্ত হইল, অধিকন্তু আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহারা স্থানে স্থানে নূতন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। শিখবীর রণজিৎ সিংহের পিতামহ সুরথ সিংহ তাঁহার পত্নীর পিত্রালয় গুজরান-ওয়ালে একটি সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে দুরাণী-রাজের প্রতিনিধি এই দুর্গটি আক্রমণ করেন। তখন শিখেরা আপনাদের গৌরবরক্ষার নিমিত্ত সুরথ সিংহের পতাকামূলে সমবেত হইল। দুরাণীরাজ প্রতিনিধি পরাজিত হইয়া লাহোরদুর্গে আশ্রয় লইলেন। লাহোর নগরে শিখেরা প্রাধান্য লাভ করিল। সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তার প্রতাপ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। হিজুন্ খাঁ নামক পঞ্চনদ প্রদেশবাসী

এক পাঠান-নায়ক সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তার প্রধান সহায় ছিলেন। শিখেরা এই বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। খালসা সৈন্য অমৃতসর তীর্থে সমবেত হইয়া পবিত্র সরোবর পরিষ্কৃত করিল। বিশ্বাসী সৈন্যদল তথায় স্নান করিল। অতঃপর সমবেত শিখগণ স্বদেশ-দ্রোহী হিঙ্গুন খাঁর অধিকৃত প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া সিরহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইল।

শিখেরা যখন উল্লিখিতরূপে আপনাদের ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল, তখন স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত আমেদ সাহ আবার সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি লাহোর নগরে উপনীত হন। ঐ সময়ে শিখেরা শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে মিলিত হইয়া সিরহিন্দ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল। আমেদ সাহ লুধিয়ানার পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। লুধিয়ানার বিশমাইল দক্ষিণে গুজরানওয়ালা ও বারনল জনপদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। অসংখ্য শিখ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিল। কেহ কেহ বলেন, এই ভীষণ আহবে পঁচিশ সহস্র শিখ মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। যে স্থানে এই অসম্ভাবিত বিপদ্ ঘটিয়াছিল আজপর্য্যন্ত শিখেরা ঐ স্থানটাকে 'ঘুলঘর' বা 'বিপদ্ ক্ষেত্র' বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আল্লা সিংহ এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার বীর-জনোচিত ব্যবহার সাহকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানপূর্ব্বক পাতিয়ালা প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কেহ কেহ মনে করেন 'মালব' ও 'মঞ্ঝ' শিখদিগের মধ্যে বিরোধ বাড়াইয়া তুলিবার নিমিত্ত সাহ বন্দীর প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়াছিলেন।

নগরে দেখা করেন, এবং কাবুলিমল নামক একজন শিখকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তখন সহসা কান্দাহারে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ শিখদের প্রাণে অনাবশ্যক বেদনাপ্রদান ও স্বীয় জঘন্য প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্বদেশগমনের পূর্ব্বে তিনি অমৃতসরের পবিত্র মন্দির ধ্বংস ও সরোবর গোরক্তে রঞ্জিত করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বড় পরাভবেও শিখেরা হতোদ্যম হইল না, তাহাদের শক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ভাবী গৌরব-লাভের আশায় তাহাদের মন উৎসাহে উৎফুল্ল থাকিত। তাহাদের দলপতিরা শত্রুনিপীড়ন ও স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। আমেদ সাহের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই শিখেরা কুসুরের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করিল; উক্তনগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল। তথা হইতে শিখেরা মালেড় কোটলায় গমন করিয়া তাহাদের পূর্ব্বতন শত্রু হিঙ্গুন খাঁকে আক্রমণ করিল। হিঙ্গুন পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর বিজয়ী শিখসৈন্য সিরহিন্দ অধিকার করিতে চলিল। শাসনকর্ত্তা জেহন খাঁ যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। উক্ত অসহায় শাসন-কর্ত্তা প্রায় চল্লিশ সহস্র শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিহত হইলেন। শতদ্রু হইতে যমুনাপর্য্যন্ত ভূভাগ, বিজয়ি-শিখসৈন্যদিগের শাসনাধীন হইল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, যুদ্ধান্তে বিজয়ী শিখগণ আপন আপন অধিকারঘোষণার নিমিত্ত অশ্বারোহণে গ্রামে গ্রামে উষ্ণীষ, গাত্রবস্ত্র, কোমরবন্ধ, তরবারী, প্রভৃতি ছড়াইয়াছিল। এইবারে শিখেরা সিরহিন্দ নগর সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস করিয়াছিল। গোবিন্দসিংহের পুত্রদ্বয় যে প্রাচীরে জীয়ন্ত সমাহিত হইয়াছিলেন, বিজয়ী শিখেরা সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

বিজয়োন্মত্ত শিখেরা যমুনা পার হইয়া সাহারণপুরে গমন করিল। নাজিবুদ্দৌলা এই সময়ে জাঠ-নায়ক সূরজমলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন ; শিখদের পরাক্রমে চিন্তিত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কৌশলে কিছু কালের জন্য শিখদিগকে থামাইয়া রাখিলেন।

আমেদ সাহ আবদালী সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি স্বীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুসংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আবার পঞ্চনদপ্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু এবারে শিখদিগের বর্দ্ধিতপ্রতাপ-দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি কৌশলে স্বীয় অধিকাররক্ষার চেষ্টা করিলেন। আমেদসাহ পাতিয়ালার সর্দ্দার আলহা সিংহকে তাঁহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন এবং লাহোর ও রোটাস নগরে সৈন্য রাখিয়া কাবুলের বিদ্রোহ দমন করিতে চলিলেন। প্রস্থানসময়ে শিখেরা পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে সাহের সৈন্যদের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভীষণ তাড়া দিয়াছিল। এই সময়ে শিখেরা লাহোর নগর অধিকার করে। তিন জন শিখনায়ক যুক্তভাবে নগরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শতদ্রু হইতে যমুনাপর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শিখদের শাসনাধীন হইল। অমৃতসর নগরে শিখদের জনসাধারণসভার এক অধিবেশন হইল। এই সভা পঞ্চনদপ্রদেশে খালসা সম্প্রদায়ের একাধিপত্য ঘোষণা করিল। বিজয়গৌরব সাধারণে প্রচার করিবার নিমিত্ত খালসাসম্প্রদায় নূতন মুদ্রার প্রবর্ত্তন করিল। ঐ মুদ্রার উপর লিখিত হইয়াছিল যে, গুরু গোবিন্দসিংহ নানকের নিকট হইতে 'দেগ' 'তেগ' ও 'ফতে' অর্থাৎ 'দানশীলতা' 'শৌর্য্য' ও 'জয়গৌরব' লাভ করিয়াছেন।

এই সময়ে দুই বৎসরের জন্য শিখেরা বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত

হয় নাই। নব-লব্ধ স্বাধীনতা তাহারা কি ভাবে সম্ভোগ করিবে, কে কতখানি রাজ্য ভোগ করিবে ইত্যাদি সমস্যা তখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণভীতি তাহাদিগকে যে ঐক্যদান করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই ঐক্যবন্ধন শিথিল হওয়াতে আত্মদ্রোহের আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেদ সাহ আবদালী শেষ বার শিখ-শক্তি ধ্বংস করিবার মানসে পঞ্চনদপ্রদেশে উপনীত হইলেন। এবারে আমেদ সাহের আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি সামর্থ্য ও উৎসাহ ছিল না; বার্দ্ধক্য তাঁহার অনন্যসুলভ শৌর্য্য বীর্য্য হরণ করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তাঁহার অনুগত পাতিয়ালার সর্দ্দার অমরসিংহকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সিরহিন্দের রাজত্ব দান করিলেন। অমর সিংহ স্বাধীন রাজার তুল্য মুদ্রাপ্রচার, রাজচ্ছত্র পতাকাদি ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলেন। লাহোরের যুক্ত-শিখ-শাসনকর্ত্তৃত্রয়ের একজন নায়কের উপর আমেদসাহ লাহোরের নিকটবর্ত্তী তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। আবদালী মনে করিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যে তিনি শিখদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন। শিখেরা বৃদ্ধ আফগানরাজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল। এবার তাঁহার সসৈন্যে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চনদপ্রদেশের উপর আফগানদের শাসনাধিকার চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইল। দুর্ভাগ্য আমেদ সাহের সৈন্যদলেও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। তিনি যখন সৈন্যসহ স্বদেশে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শিখেরা তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে এমন তাড়া দিয়াছিল যে, তিনি বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমেদসাহ সিন্ধু নদী পার হইতে না হইতে শিখেরা লাহোর ও রোটাস অধিকার করিল। তাহারা সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশের অখণ্ড অধিকার লাভ করিল।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেদ সাহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র তাইমুর পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। বিক্রমশালী শিখনায়কগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে তিনি সাহসী হন নাই। পঞ্চনদপ্রদেশের এক প্রান্তস্থিত মুলতান নগর অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আফগানরাজ সাহ জুমান লাহোর নগর পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণ বৃত্তান্ত যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

শিখ মিশল বা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান

খালসা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দসিংহ শিখদের শেষ গুরু। বন্দা খালসা সৈন্যদের নায়ক মাত্র ছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বাসী শিখেরা তাঁহাকে নায়ক বলিয়া স্বীকার না করিলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শিখদিগের নেতা বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বন্দার মৃত্যুর পরে শিখেরা নেতৃ-শূন্য হইয়া একান্ত অসহায় হইয়া পড়ে। মোগলশাসনকর্ত্তাদিগের প্রবল উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘ কাল তাহাদিগকে নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে হইয়াছিল। ক্রমে মোগল রাজশক্তি যখন খর্ব্ব হইতেছিল, তখন শিখেরা আপনাদের পল্লীগুলি দখল

করিতে লাগিল। এক একজন শক্তিশালী সর্দ্দারের অধীনে শিখেরা দল-বদ্ধ হইয়া ছোট ছোট সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

দেশের শাসন-শৈথিল্য এই সম্প্রদায়গুলিকে প্রবল করিয়া দিতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা সুযোগ পাইলেই জাঠ-কৃষকদিগের উপর উৎপীড়ন করিতেন। উৎপন্ন শস্তে কৃষকদের জঠর-জ্বালা নিবারিত হইত না। কাজেই এই অরাজকতার দিনে নিরন্ন কৃষককুল শক্তিশালী নায়কদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠন ব্যবসায় গ্রহণ করিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আফগানেরা পঞ্চনদপ্রদেশে তাহাদের শাসনাধিকার বিস্তারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। শিখেরা তাহার পূর্ব্বেই বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শক্তিশালী সর্দ্দারদিগের অধীন এই ছোট ছোট দলগুলি 'মিশল' নামে খ্যাত।

যে সকল দলপতির অধীনে শিখমিশলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই অখ্যাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন সমর-নৈপুণ্যে ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যে এক এক দল অশ্বারোহী সেনার নায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কৃষক, কেহ বা সামান্য শিল্পী ছিলেন। লুণ্ঠন ও দস্যুতা দ্বারাই তাঁহারা আপনাদের অর্থসম্পৎ ও ভূসম্পত্তি বাড়াইয়া তুলিতেন।

মিশলের সর্দ্দারদের কোনো বিশেষত্বজ্ঞাপক আখ্যা ছিল না। তাঁহারা সর্দ্দার নামেই অভিহিত হইতেন। অধীন লোকদের উপর তাঁহাদের একাধিপত্য ছিল না; শাসনপ্রণালী মোটামুটি প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক শিখই স্বাধীন এবং প্রত্যেকেরই ক্ষমতা সমান। মিশলের প্রত্যেক শিখ বিজিতরাজ্যের অংশ ও লুণ্ঠিতধনের ভাগ পাইত। দলপতিরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের চালক এবং বিবাদ

বিসংবাদে তাহাদের মধ্যস্থ হইতেন। একাধিক দলপতি একত্র হইয়া কিছু লুণ্ঠন করিলে প্রথমে লুণ্ঠিত দ্রব্য দলপতিদের মধ্যে তুল্য পরিমাণে বিভক্ত হইত, পরে প্রত্যেক দলপতি প্রাপ্ত দ্রব্য আপন আশ্রিত লোকদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। কোনো শিখযুবক এক দলপতির অধীনে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিলে, তাহাকে আজীবন তাহার অধীনেই কার্য্য করিতে হইবে, এমন কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না; সুযোগ পাইলে এক নেতার আশ্রিত শিখেরা কার্য্য ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় কোনো নেতার অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিত। সুতরাং দলপতিরা আশ্রিতদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জনেরই চেষ্টা পাইতেন।

জাঠযুবকেরা কোনো মিশলে প্রবেশ করিতে পারিলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিত। প্রসিদ্ধ দলপতিদের নিকটে পাহুল গ্রহণ একটা বিশেষ গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত। জাঠযুবকেরা মনে করিত, মিশলে প্রবেশাধিকার পাইলেই তাহাদের নিকট ভাবী গৌরবের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

মুসলমানদের শাসনাধিকার বিলুপ্ত হইবার প্রাক্কালে পঞ্চনদপ্রদেশে উল্লিখিতরূপে স্বাধীন শিখমিশলের উদ্ভব হইতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন শিখ-মিশলগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপনের একটা প্রবল কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। আফগানরাজ আমেদ সাহের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দলগুলিকে মাঝে মাঝে সমবেত হইতে হইত। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল, প্রবল বহিঃশত্রুর সহিত দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া, তখন তাহা প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্রই শিখেরা সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভুলিয়া দেশ-শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইত। তাহাদের জাতীয় মহাসভা

বা গুরুমঠই সকলের মিলন-ভূমি ছিল। শিখেরা ছোট বড় অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বারটা প্রধান দলের নাম করিয়াছেন।

(১) ভাঙ্গী—লাহোরের নিকটবর্ত্তী পাঁজওয়ার গ্রামের সর্দ্দার জসা সিংহ এই মিশলের প্রথম দলপতি। তিনি বন্দার অনুচর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ভীমসিংহ, মুল্লাসিংহ ও জগৎসিংহ নামক তিনজন আত্মীয়কে সহায় করিয়া তিনি এই দলটি গড়িয়া তুলেন। দস্যুতাই তাহাদের ব্যবসায় ছিল। জগৎসিংহ প্রচুর পরিমাণ ভাঙ্গ সেবন করিতেন বলিয়া এই দলের লোকদের মধ্যে এই মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল। "সিদ্ধিসেবনে বুদ্ধি বাড়ে" এইরূপ প্রবাদও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লাহোর ও অমৃতসর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে বিতস্তা নদীপর্য্যন্ত এই দলের শিখদের বসতি ছিল। এক সময়ে ভাঙ্গীরা ক্ষমতায় সকল মিশলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

(২) নিশানী—খালসা সৈন্যদলের পতাকা-বাহকদের দ্বারা এই দলটি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

(৩) সুহিদ ও নেহাং—ধর্ম্মার্থে আত্মত্যাগী কয়েকজন বীরের বংশধরেরা এই দল দুইটা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

(৪) রামঘোরিয়া—এই মিশলের প্রথম সর্দ্দারের নাম কুশল সিংহ। তিনি বন্দার অনুচর ছিলেন, নায়কের মৃত্যুর পরে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। কুশল সিংহের মৃত্যুর পরে নন্দ সিংহ এই সম্প্রদায়ের দলপতি হন। তাঁহার নায়কতায় মিশলটি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জসা সিংহ নামক তাঁহার এক অনুচর যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনিই মিশলের সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিতেন। লাহোরের নিকটবর্ত্তী

রামরাওনি নামক স্থানে এই সম্প্রদায়ের একটি দুর্গ ছিল। শিখেরা ঐ দুর্গটিকে ভগবানের দুর্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঐ দুর্গের নাম হইতেই মিশলের নামকরণ হইয়াছিল। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের শিখেরা বাস করিত।

(৫) নুকিয়া—লাহোরের দক্ষিণে নুকিয়া নামক এক গ্রামে এই মিশলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৬) আল্লুওয়ালিয়া—এই মিশলের প্রথম সর্দ্দার জসা আল্লুওয়ালিয়া নামে খ্যাত। আল্লু নামক জনপদ তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। জসা,তাঁহার পিতৃব্য ও আরো কয়েকজন আত্মীয় ফইজুলপুরিয়া মিশলে কার্য্য করিতেন। জসা এই দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া স্বয়ং একটি স্বাধীন মিশলের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বহু অনুচর জুটিয়া গেল। তিনি সুবিখ্যাত দস্যু হইয়া উঠিলেন। আল্লু, সিরিয়াল, নিল্লিয়াল, গোবিন্দওয়াল, ভোপাল প্রভৃতি বহুজনপদ তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইল। জালন্ধর দোয়াবে তিনি সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচর তাঁহাকে 'বাদসাহ' বলিয়া সম্বোধন করিত। শিখ ইতিহাসে জসা সিংহ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করিয়া তিনি স্বাধীন খালসা রাজ্যের ঘোষণা করেন।

(৭) ঘুনিয়া বা কুনিয়া—অমর সিংহ এই মিশলের প্রথম সর্দ্দার। বিখ্যাত লুণ্ঠনকারী বলিয়া চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনেক লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার দলের শিখেরা খানা, কাচওয়া প্রভৃতি জনপদে বাস করিত। এই মিশলের দ্বিতীয় দলপতি জয় সিংহ বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার এক পুত্র রাম-ঘোরিয়াদের সহিত সংগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র-বধূ সুদাকৌউর

মহারাজ রণজিৎ সিংহের শাশুড়ী। এই রমণী কয়েক বৎসর কাল রণজিতের রক্ষয়িত্রী ও অভিভাবিকা ছিলেন।

(৮) কুইজুলপুরিয়া—অমৃতসর নগরের নিকটবর্ত্তী কইজুলপুর জনপদের কর্পূর সিংহ এই মিশলের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বে ইনি বন্দার অনুচর ছিলেন। তিনি যেমন বীর তেমনি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। নবাব কর্পূর সিংহ নামে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। এই মিশলটির ক্ষমতা বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জালন্ধর দোয়াবে অনেক ভূম্যধিকারী কর দান করিয়া ইঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিল। রাও ইব্রাহিম ইঁহাদের অন্যতম।

(৯) সুকরচুকিয়া—মহারাজ রণজিতের পিতামহ স্বরথ সিংহ সুকরনামক এক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি এই মিশলটি স্থাপন করেন।

(১০) ডুল্লেওয়ালিয়া—শতদ্রু নদীর উপরের অংশটার দক্ষিণতীর এই সম্প্রদায়ের শিখদের বাসভূমি। প্রথম দলপতির বাস-গ্রামের নামানুসারে মিশলটির নাম হইয়াছে।

(১১) ক্রোর সিংহিয়া—মিশলের তৃতীয় দলপতির নামানুসারে এই নামটা রাখা হইয়াছে। কখনো কখনো এই দলটিকে পাঞ্জঘরিয়া বলা হয়; কারণ এই মিশলের প্রথম দলপতি পাঞ্জঘরিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

(১২) পুলকিয়া—পাতিয়ালার আল্হা সিংহ যে বংশে জন্মিয়াছেন এই সম্প্রদায়ের শিখেরাও সেই বংশীয়। শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী সুনাম ও ভুটিণ্ডা এই শিখদের বাসভূমি ছিল।

উপরে যে কয়েকটি শাখাসম্প্রদায়ের নাম করা হইল, তদ্‌ভিন্ন অপর এক শ্রেণীর শিখ, ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহারা

আকালী-শিখ

'আকালী' নামে খ্যাত এবং নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক শিখ। ধর্ম্ম-গ্রন্থানুমোদিত প্রত্যেক খুঁটিনাটি আচার তাহারা মানিয়া চলিত। আকালীরা আপনাদিগকে ভগবানের সৈন্ত বলিয়া মনে করিত। নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ও পিত্তল-বলয় তাহাদের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। স্বধর্ম্মরক্ষার্থে তাহারা পারিবারিকসুখ-সাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করিত। উৎসাহী ও বিক্রমশালী আকালীরা পুণ্যভূমি অমৃতসর রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র-হস্তে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, শ্রদ্ধাবান্ ও বিনীত আকালীরা মন্দিরের সেবকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করিত। ভিক্ষান্ন তাহাদের উপজীবিকা ছিল। তাহারা কখনো কোনো শিখদলপতিকে অবমানিত না করিলেও দলপতিরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। জাতীয় মহাসভায় তাহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহারা বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আকালীরা প্রচলিত শাসন মানিয়া চলিত না। এই দুর্দ্দান্ত সম্প্রদায়টিকে স্ববশে আনয়ন করিতে মহারাজ রণজিৎকে প্রভূত আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ম্যালকলম বলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গোবিন্দ সিংহের কোনো রচনা হইতে তিনি তাঁহার এই উক্তি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

পুলকিয়া ব্যতীত অপর শিখ-শাখাসম্প্রদায়গুলি শতদ্রু নদীর উত্তর-তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। লাহোরের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জনপদগুলি 'মঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল। এই নিমিত্ত পুলকিয়া ভিন্ন অপর শিখমিশলগুলির শিখেরা 'মঞ্জশিখ' নামে খ্যাত। পুলকিয়া এবং শতদ্রুর দক্ষিণতীরের অপর শিখেরা 'মালবশিখ' নামে খ্যাত। সিরহিন্দ ও সার্শার মধ্যবর্ত্তী জনপদগুলির সাধারণ নাম ছিল 'মালব'

শাখা-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ফইজুল্লাপুরিয়া, আলুওয়ালিয়া ও

রামঘোরিয়া এই তিনটা প্রথমে প্রাধান্য লাভ করে। কালক্রমে ভাঙ্গীরা জাগিয়া উঠিলে ইহাদের গৌরবের লাঘব হইয়াছিল। কুনিয়া ও সুকর চুকিয়াও কিছুদিনের নিমিত্ত জাগিয়া উঠিয়াছিল। নিশানীরা ও সুহিদেরা কোনোকালে খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। কাপ্তান মারে এই দল দুইটিকে মিশল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইহাদিগকে মিশল বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। 'মালব' প্রদেশে পাতিয়ালার আল্‌হাসিংহ আমেদসাহ দুরাণীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শিখমিশলগুলির মধ্যে সৈন্যবলে ভাঙ্গীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের দলে বিশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল। ছোট ছোট দলগুলিতেও দুই সহস্র করিয়া অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। শিখেরা অশ্বারোহণে পলিতা-বন্দুক-চালনে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। পদাতিক সৈন্যেরা দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকিত, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রকাশে একান্ত অসমর্থ ছিল। সে সময়ের শিখেরা কামানের ব্যবহার জানিত না। মিশলের পদাতিক শিখ কোনোরূপে একটা অশ্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অশ্বারোহী সৈন্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইত।

শিখদলপতিরা মোগল ও আফগান শাসনকর্ত্তাদের সহিত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন। দুরাণীরাজ আমেদ সাহের সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে পশ্চাৎ ও পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিয়া শশব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে আমেদ সাহের সহিত ভীষণ সংগ্রামে—'ঘুলঘরে' একদিনের যুদ্ধে পঁচিশ সহস্র শিখ জীবন দান করিয়াছিল, দলপতিদের সম্মিলিত শক্তির নিকট পরিশেষে সেই আমেদসাহকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমেদসাহের মৃত্যুর পরে কুনিয়ানায়ক জয়সিংহ, রামঘোরিয়ানায়ক জসাসিংহ, ফইজুলপুরিয়া-নায়ক কুশলসিংহ ও আলুওয়ালিয়া নায়ক

জসা সিংহ আপনাদের সমবেত শক্তিবলে পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহারাই শিখস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা।

বহিঃশত্রুর সহিত দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রামের পর শিখেরা স্বাধীনতা লাভ করিল। দলপতিরা দেশটা আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইলেন; কতকগুলি খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে দেশটা বিভক্ত হইয়া পড়িল। বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে নামমাত্রে একটা যোগ ছিল। বৎসরান্তে দলপতিরা পুণ্যভূমি অমৃতসরে একবার মিলিত হইতেন। সত্য বটে দলপতিরা ধর্ম্মের নামে পরস্পরের সহিত মিলিত ছিলেন; কিন্তু অচিরেই তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারলালসা ও স্বার্থপরতা ধর্ম্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিল। শিখনায়কদিগের মধ্যে ভীষণ আত্মদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশে অরাজকতা, অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে লাগিল। প্রতিভাহীন দলপতিরা পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্বাধীনতারস শিখদিগকে যখন উল্লিখিতরূপে উন্মত্ত করিয়া পতনের দিকে লইয়া যাইতেছিল, তখন রণজিৎ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

নবম অধ্যায়

রণজিৎ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ

শিখবীর রণজিৎসিংহ অখ্যাতকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতৃপিতামহগণ শিখ-ইতিহাসে অল্পাধিক খ্যাতি লাভ করিয়া-

ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কোনো এক পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা নানকের উদার ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রকে শিখ-ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া যান। পুত্র পরিণতবয়সে স্বর্গীয় পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মশীল জনকের ন্যায় শিষ্টপ্রকৃতির লোক ছিলেন না; অমৃতসর হইতে পাহুল গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন মধ্যেই তিনি এক দস্যুদলে প্রবেশ করেন। পশু-অপহরণ তাঁহার ব্যবসায় হইল! শেষ-গুরু গোবিন্দসিংহের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিবার পর গ্রামবাসীরা তাঁহাকে আপনাদের দলপতি মনোনীত করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার ন্যায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান-আক্রমণের সময়ে তিনি এক মিশলে প্রবেশ করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পুত্র সুরথ সিংহ রণজিতের পিতামহ। উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে সুরথ ৯০ বিঘা ভূমি ও একটি জলাশয় পাইয়াছিলেন। দেড়শত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার অধীন ছিল। এই সৈন্যদলকে সহায় করিয়া তিনি তাঁহার অধিকার বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। তিনি পিণ্ডানখাঁ, 'নুপথানা প্রভৃতি কতকগুলি জনপদ অধিকার করেন। অবশেষে দ্বিতীয় এক শক্তিশালী সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি একটি স্বাধীন শাখা-সম্প্রদায় গঠন করেন। সুরথের বাস-গ্রামের নামানুসারে ঐ মিশলটির নাম 'সুকরচুকিয়া' হইল

অতঃপর সুরথ মুসলমানদের অধিকৃত একটি নগর অধিকার করিলেন। মুসলমানপক্ষের সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। বিজয়ী সুরথ সিংহ বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ও ধনরত্ন লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি গুজরানওয়ালে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। এইরূপ জয়লাভে সুরথের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মিশলের জনবল বাড়িয়া গেল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুরাণীরাজ আমেদসাহ যখন শেষবার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, সুরথসিংহ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আপন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পলায়নপর আফগানসৈন্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি রোটাস দুর্গ ও মুসলমানদের অধিকৃত কতকগুলি নগর অধিকার করেন। বিতস্তা নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন হইল। স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শিখেরা আফগানদের সহিত শেষবার যে সংগ্রাম করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে সুরথ সিংহের বীরত্ব শিখদিগের বিজয়ী হইবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল। শিখদের ভীষণ শত্রু আমেদসাহ যখন পরাজিত হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন, তখন শিখ-নায়কেরা প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হন। সুরথ সিংহের ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কদিগের ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারা সুরথসিংহের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। সুরথ সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র মহাসিংহ দশবৎসরের বালক ছিলেন। তিনি বিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। শিখ-ইতিবৃত্তে অনেক তেজস্বিনী রমণীর কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাসিংহের জননী ঐ বীররমণীদের অন্যতমা।

ভীষণ সংঘর্ষের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীমিশলের সর্দ্দারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি পাঁচ বৎসরকাল পুত্রের নামে একটা মিশল ও বিস্তৃত রাজ্য সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাসিংহ স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী একটা শক্তিশালী মুসলমান সম্প্রদায়কে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বীয় রাজ্য বাড়াইয়া তুলিলেন। বয়সে বালক হইলেও তাঁহার বীরত্বে অনেক প্রবীণ শিখনায়ক পরাজিত হইলেন, কেহ কেহ তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। পিতার সাহসিকতা, রণদক্ষতা পুত্র রণজিৎ লাভ করিয়াছিলেন। মহাসিংহের নায়কতায় সুকরচুকিয়া মিশল খুব শক্তিশালী হইয়াছিল। কুনিয়া মিশলের দলপতি জয়সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত যুদ্ধে কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইয়া মহাসিংহের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। মহাসিংহ যখন সপত্নীক জ্বালামুখী তীর্থে গমন করেন, জয়সিংহ তখন তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ তেজস্বিনী সুদাকৌঁউড়কে পৌত্রী মহাতবকৌঁড়ের সহ পাঠাইয়া দেন। সুচতুরা সুদাকৌঁউড়ের সহিত মহাসিংহের পত্নী রাজকৌঁড়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। সুদাকৌঁউড় রণজিতের সহিত মহাতবার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। বিবাহ বাচনিক স্থিরীকৃত হইয়া গেল। মহাসিংহের মৃত্যুর পরে এই বিবাহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদপ্রদেশের মহাবীর রণজিৎসিংহ গুজরানওয়াল* নামক ক্ষুদ্র জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হইলেন। বিপন্ন বালক রণজিতের সম্পত্তিরক্ষার ভার দেওয়ান লাখপৎ সিংহ, জননী ও বাগ্‌দত্তা পত্নী মহাতবার জননী সুদাকৌঁউড়ের উপর পতিত হইল। বীরশিশু রণজিৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

* গুজরানওয়াল অধুনা একটি নগর হইয়া উঠিয়াছে।

দশম অধ্যায়

রণজিতের সংসারপ্রবেশ
ও
শিখ-দলপতিগণের সহিত
সংগ্রাম

পিতৃবিয়োগের পরে বালক রণজিৎ যখন সংসারে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার অবস্থা বিপৎসঙ্কুল ছিল। প্রতিপদে বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশে অরাজকতা ও আত্মদ্রোহ বিরাজ করিতেছিল, পূর্ব্বেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিভাশালী রণজিৎ আপনার অসামান্য বীরত্ববলে দেশব্যাপী অরাজকতা ও অশান্তি দূর করিয়া স্বদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন। বিবাদরত দেশনায়কদিগকে বশীভূত করিয়া তিনি একমাত্র স্বাধীনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পতাকামূলে মিলিত হইয়াই শিখেরা এক বীরজাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক রণজিতের জননী সুচরিত্রা ছিলেন না। রণজিৎ যখন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন মা হইয়াও তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। আপনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার

লালসায় তিনি পুত্রস্নেহও বিস্মৃত হইলেন! রণজিৎ অনন্যোপায় হইয়া জননীকে এক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

জননীর ন্যায় শাশুড়ী সুদাকৌঁউড়ও রণজিতের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সুচতুরা রমণী অতিশয় উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। জামাতা রণজিৎকে সহায় করিয়া তিনিই সুকরচুকিয়া ও কুনিয়া এই দুই মিশলের নেত্রী হইবেন, তাঁহার মনে মনে এই সাধ ছিল। এই দুরাশার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি নীতি-বিগর্হিত উপায় অবলম্বনেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। বিদ্যা উপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি কখনো রণজিৎকে উৎসাহ দান করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাকে বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহার মনোরথসিদ্ধি হইল না। শিক্ষার অভাব রণজিতের স্বভাবোজ্জ্বল প্রতিভা ম্লান করিতে পারিল না এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাঁহার অনন্যসুলভ সবলদেহ ও স্বাস্থ্য দীর্ঘকালেও বিনষ্ট করিতে পারিল না।

বুদ্ধিমতী সুদাকৌঁউড় রণজিৎকে সর্ব্বদা স্ববশে রাখিয়া স্বয়ং কর্ত্রী হইবার চেষ্টা করিলেও তিনি রণজিতের প্রথম জীবনে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। সুদাকৌঁউড়ের অর্থবল জনবল ও বুদ্ধিবলে বলী হইয়াই রণজিৎ প্রতিদ্বন্দ্বী শিখনায়কদিগকে অনায়াসে স্ববশে আনিয়াছিলেন এবং লাহোর ও অমৃতসর নগর জয় করিতে পারিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে প্রবল শত্রুব্যূহের মধ্যে সুদাকৌঁউড়ই তাঁহার রক্ষয়িত্রী ছিলেন।

রণজিতের মহিষীগণের মধ্যে মহতবা প্রথমা ও প্রধানা ছিলেন। কুনিয়া মিশলের দলপতি জয়সিংহের পৌত্রী বলিয়া বংশগৌরবে ও ক্ষমতায় মহতবা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। এই পত্নীর জননী বলিয়া সুদাকৌঁউড়েরও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মহতবা পুত্রবতী ছিলেন না। সুদাকৌঁউড় বুঝিলেন যে, পুত্রসন্তান প্রাপ্ত না করিলে মহতবার প্রাধান্য

সের সিং

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। মহারাজ রণজিৎ একবার যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইয়া দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন, সুচতুরা সুদাকৌঁউড় তখন ঈশ্বরসিংহ নামক এক সদ্যোজাত শিশুকে মহতবার গর্ভজাত পুত্র বলিয়া চালাইয়া লইলেন। এই শিশুটি দেড় বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। সুদার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ যখন শতদ্রুতটপ্রদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সুদাকৌঁউড় দ্বিতীয়বার এক তাঁতীর পুত্র ও এক দাসীর পুত্রকে মহতবার যমজ পুত্র বলিয়া চালাইলেন। তীক্ষ্ণধী রণজিৎ শাশুড়ীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও কোনো উচ্চবাচ্য করিলেন না। এই পুত্রদ্বয়ের নাম সেরসিংহ ও তারাসিংহ রাখা হইল। তাহারা রাজভবনে রাজপুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তারাসিংহ স্বভাবতঃই নির্বোধ ছিল। সেরসিংহ অল্পধী হইলেও পরম সুন্দর ও সাহসী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বার বৎসর বয়সে এক যুদ্ধে সেরসিংহ যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ করেন। রাজনীতিজ্ঞ রণজিৎ তখন তাঁহার শাশুড়ীকে জানাইলেন যে, তাঁহার দৌহিত্র এখন মিশলের দলপতি হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার উপর কুনিয়া মিশলের পরিচালনের ভার অর্পণ করুন। ধূর্ত্ত সুদাকৌঁউড় এত দিনে আপনার ফাঁদে আপনি আটক পড়িলেন। কর্ত্তৃত্বের প্রলোভন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তিনি কোনোক্রমেই মিশলের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তিনি পলায়ন করিয়া সাদারা নামক স্থানে গমন করিয়া গোপনে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সুদার সমস্ত অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লাহোরে আহ্বান করেন। সুদা তাঁহার সমক্ষে আনীত হইলে রণজিৎ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন। অপমানিতা সুদা দ্বিতীয়বার পলায়নের চেষ্টা করিয়া ধরা পড়েন। এবার রণজিৎ

তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কারাগারে অভিমানিনী সুদাকৌঁউড়ের জীবলীলার পরিসমাপ্তি হয়। কুনিয়া মিশল রণজিতের শাসনাধীন হইল। সের সিংহকে তিনি এক খণ্ড জায়গীর প্রদান করিলেন। নাওনিহাল সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সের সিংহ পঞ্চনদ-প্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দিন রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। শিখনায়কদের ষড়যন্ত্রে অল্পদিন-মধ্যেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী রণজিতের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। পারিবারিক বিরোধ ও শাখাসম্প্রদায়গুলির প্রতিকূলতা তাঁহার দ্রুত উন্নতিলাভে ও বিজয়কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। তাঁহার সংসারপ্রবেশের অল্প কয়েক বৎসর পরেই প্রসিদ্ধ আফগান আক্রমণকারী আমেদ সাহের পৌত্র সাহ জুমান পঞ্চনদপ্রদেশের শাসনাধিকার পুনরুদ্ধারমানসে সসৈন্যে দুইবার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। প্রথমবারে তিনি ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহ লাহোরে উপনীত হন। কোনো কোনো শিখদলপতি বিনাযুদ্ধে তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইরূপে সাহ শিখদিগের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার সহোদর মাহামুদ বিদ্রোহী হইয়াছেন: অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার নির্ব্বিবাদে লাহোর নগরে উপনীত হন। কসুরের নবাব নিজামুদ্দিন তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। এবারে সাহ কখনো ভয় দেখাইয়া, কখনো বা বন্ধুতার ভান করিয়া শিখদিগকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শিখদিগের সহিত ছোটখাটো কয়েকটা সংগ্রামও ঘটিল। এই যুদ্ধগুলিতে সর্দ্দার রণজিৎ

সিংহের বীরত্ব কেবল মাত্র শিখদলপতিদিগকে নহে, সাহজুমানকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। সর্দ্দার রণজিৎ সিংহ রাজধানী লাহোর নগরটি লাভ করিবার মানসে সাহজুমানের নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করেন। ঘটনাক্রমে সাহজুমানও এইসময়ে বিদ্রোহী সহোদরকে দমন করিবার মানসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রবল প্লাবনের মধ্যে বিতস্তা নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে সাহের বারটি কামান নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়। কামান উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি উচ্চাভিলাষী রণজিৎকে জানাইলেন যে, তিনি কামান উদ্ধার করিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে লাহোর নগর ও রাজা উপাধি দান করা যাইবে। রণজিৎ আটটা কামান উদ্ধার করিয়া সাহের নিকট পাঠাইলেন, তিনি রণজিৎকে রাজা উপাধি ও লাহোরের শাসনাধিকার দান করিলেন।

লাহোর নগর প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবৎ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই লোভনীয় নগরটির শাসনাধিকার পাইবার নিমিত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিখমিশলের দলপতিরা প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছেন। এক একবার তাঁহারা নগরটা মুসলমানদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন, আবার মুসলমানেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নগর অধিকার করিয়া লইয়াছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গীসর্দ্দার গুজ্জর ও লেহনা সিংহ এবং কুনিয়া-সর্দ্দার শোভা সিংহ সম্মিলিত হইয়া লাহোর নগর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। আমেদ সাহের প্রতিনিধি কাবুলমন কিছুকাল সংগ্রাম করেন। অবশেষে একদা রাত্রিকালে অসমসাহসী ভাঙ্গীসর্দ্দারদ্বয় একটা পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া নগরে প্রবেশ করেন। নৃত্যগীতে উন্মত্ত আফগানরাজ-প্রতিনিধি তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। রজনী প্রভাত হইতে না

হইতে নগর শিখদিগের করায়ত্ত হইল। শোভাসিংহ, গুজর ও লেহনা নগরটা তিনভাগ করিয়া লইলেন। তদবধি লাহোর শিখদিগের শাসনাধীনই রহিয়াছে। আমেদ সাহ শেষবার পাঞ্জাব আক্রমণের সময়ে গুজর সিংহের উপরই লাহোরের শাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। সর্দ্দার রণজিৎ সাহজুমালের নিকট নামমাত্র লাহোর নগরের শাসনাধিকার পাইয়াছিলেন; পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দার তিনজনের বংশধরেরাই লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লেহনা ও শোভাসিংহের পুত্রেরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ ছিল। তাহাদের উৎপীড়নে লাহোরের অধিবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। রণজিৎ সাহের নিকট হইতে লাহোর নগরের শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছেন শুনিয়া নগরের অধিবাসীদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা সর্দ্দার রণজিৎকে নগর অধিকার করিয়া লইবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। গুজর সিংহের বংশধর সাহেব সিংহ বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে লাহোর নগরে ছিলেন না রণজিৎ সসৈন্যে নগরদ্বারে উপনীত হইলেন, নগরবাসীরা তাঁহাকে আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তৃরূপে বরণ করিয়া লইল। অযোগ্য শাসনকর্ত্তৃদ্বয় নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বিনা সংগ্রামে রণজিৎ লাহোরের প্রভু হইলেন।

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে রণজিৎ লাহোর অধিকার করিয়া ও রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাফল্য শিখদলপতিগণের মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করিল। রামঘোরিয়া ও ভাঙ্গীসর্দ্দারেরা রণজিৎকে গোপনে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিলেন। ভাসিন নামক স্থানে এক সভার অধিবেশন সময়ে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। তীক্ষ্ণধী রণজিৎ পূর্ব্বেই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। তিনি সৈন্যবলে বলী হইয়া

ভাসিনে গমন করেন এবং তথায় উৎসবে, ভোজে ও শিকারে দুইমাস যাপন করিয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করেন। শত্রুরা তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতেও সাহসী হইল না।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আমেদ সাহ আবদালি যুদ্ধান্তে লাহোর নগরে একটা কামান ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ইতিহাসে ঐ কামানটা—'জমজমা' নামে খ্যাত। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগর যখন শিখদের হস্তগত হয় তখন পূর্ব্বোক্ত কামানটা রণজিতের পিতামহ সুরথ সিংহের অংশে পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। রণজিৎ যখন লাহোর নগরের প্রভু হইলেন তখন ঐ কামান অমৃতসরে ভাঙ্গীসর্দ্দারের নিকটে ছিল। তিনি কামানটা দাবী করিলেন। ভাঙ্গীসর্দ্দারেরা তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ ভাঙ্গীসর্দ্দারদিগের অমৃতসর নগরস্থ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ভাঙ্গীরা অমৃতসর হইতে তাড়িত হইয়া রামঘোরিয়াদের শরণাপন্ন হইলেন। পুণ্যভূমি অমৃতসর রণজিতের করায়ত্ত হইল। তার পর তিনি একে একে ভাঙ্গিদের অপর দুর্গ ও জনপদ গুলি জয় করিয়া লইলেন। ভাঙ্গীসর্দ্দার সাহেব সিংহকে তিনি একখানি গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন, সর্দ্দার তথায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্টভাগ যাপন করেন। সাহেব সিংহের পুত্র গোলাব সিংহও কয়েকটি জনপদ পাইয়াছিলেন। ইনি অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গীদের সমস্ত সম্পত্তি রণজিতের অধিকারভুক্ত হয়।

পবিত্র শিখতীর্থ অমৃতসর এবং শিখদের রাজনৈতিক মিলনভূমি লাহোর রণজিতের শাসনাধীন হওয়ায় তিনি এক্ষণে ক্ষমতায় পঞ্চনদ-প্রদেশে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাফল্য লাভের পথ ক্রমেই সুগম হইয়া উঠিল। তাঁহার রাষ্ট্রগঠন-কামনার প্রতিকূলে কেহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে

পারিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার বিজয়কার্য্য অব্যাহতগতিতে চলিতেছিল।

একে একে শিখদলপতিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রণজিৎ সচেষ্ট হইলেন। রামঘোরিয়া মিশলের সর্দ্দার জসাসিংহ বার্দ্ধক্য-হেতু অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে এই শাখাসম্প্রদায় তাঁহার শাসনাধীন হইবে। জসার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোধসিংহ বিনা যুদ্ধে রণজিতের আনুগত্য স্বীকার করেন। যোধসিংহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি লইয়া উত্তাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। তখন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ রামঘোরিয়া-নায়ক দেওয়ানসিংহ ও বীরসিংহকে বন্দী করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশ স্বরাজ্য ভুক্ত করেন। তিনি রামঘোরিয়াদের অধিকারভুক্ত প্রায় ১০৮টি দুর্গ ধ্বংস করেন। কয়েক মাস পরে বীরসিংহ ও দেওয়ানসিংহকে মুক্তিদান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়াছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ নুকিয়া-সর্দ্দারের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ উভয় মিশলের শত্রুতা দূর করিতে পারে নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার খাঁ সিংহ এই শাখাসম্প্রদায়ের দলপতি নিযুক্ত হন। মহারাজ রণজিৎ তাঁহাকে আপন সভাসদ্ হইবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। নূতন নুকিয়াসর্দ্দার আপনাকে পদ-গৌরবে রণজিতের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তিনি স্পর্দ্ধাসহকারে রণজিতের আহ্বান অগ্রাহ্য করেন। বীরবর রণজিৎ প্রকাশ্য যুদ্ধে নুকিয়া-সর্দ্দারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শাসনাধীন স্থানগুলি স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ ফইজুলপুরিয়া মিশলের সর্দ্দার

বুধসিংহকে আক্রমণ করেন। বুধসিংহ পরাজিত হইয়া শতদ্রুর পরপারে পলায়ন করেন। রণজিৎ তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া ফকির আজিজুদ্দিনের ভ্রাতাকে উক্ত প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সর্ব্বশেষে রণজিৎ কুনিয়া মিশল আপনার শাসনভুক্ত করেন। যেরূপে এই মিশল তাঁহার অধিকারে আইসে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

রণজিৎ ও পাঞ্জাবী মুসলমান

পঞ্চনদপ্রদেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া জাঠ ও মুসলমানদের বাসভূমি হইয়াছে। আমরা এযাবৎ জাঠ-শিখদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পাঞ্জাবী মুসলমানদের সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই। চন্দ্রভাগা নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী জেলাগুলিতে সাধারণতঃ শিখ অধিবাসীর সংখ্যা বেশী, উক্ত নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে জনসংখ্যায় মুসলমানেরাই প্রধান। উত্তর পশ্চিমে সীমান্তপ্রদেশ-সংলগ্ন জেলাগুলিতে শিখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে অঞ্চল মুসলমানদেরই রাজ্য। পঞ্চনদপ্রদেশের মুসলমানেরা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অনেক সম্প্রদায়ই বংশ-গৌরবে প্রসিদ্ধ। দেশীয় সৈন্যদলে তিওয়ান,

সিয়াল ও মুলতানী মুসলমানেরা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পাঞ্জাবী মুসলমানেরাও পাঞ্জাবী শিখদিগের তুল্য সমর-নিপুণ। রণজিতের ন্যায় প্রতিভাশালী নায়কের অধীনে শিখেরা যেমন একটা বীরজাতি হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল, পাঞ্জাবী মুসলমানেরা তেমন কোনো নায়কের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। সময়ে সময়ে দুই একজন প্রতিভাহীন উৎসাহী মুসলমান ক্ষণকালের জন্য মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কিছু গড়িতে পারেন নাই; তাঁহাদের উত্তেজনা-বহ্নিতে মুসলমানেরা তৃণবৎ দগ্ধ হইয়াছিল। দল বাঁধিয়া উঠিতে না পারায় পাঞ্জাবী মুসলমানেরা পঞ্চনদপ্রদেশে কখনো প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। জয়লক্ষ্মী স্থিরবুদ্ধি ও শক্তিসম্পন্ন শিখদিগকেই জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চনদপ্রদেশের একাধিপত্যলাভের নিমিত্ত রণজিৎ যেমন শিখ-শাখাসম্প্রদায়গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি ছোট ছোট মুসমলমান-সম্প্রদায়গুলির সহিতও সংগ্রাম করিয়াছেন। দীর্ঘকাল কঠোর যুদ্ধের পর তিনি সমগ্র প্রদেশের প্রভু হইয়াছেন।

লাহোরের নিকটবর্ত্তী সেখোপুরা ও ঝাঙ্গ অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটা গ্রামে খরল (Kharals) সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বাস করিত। এই সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বড়ই দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, তাহারা কখনো কোনো শাসন মানিয়া চলিতে চাহিত না। শত্রুসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা দুর্গম গভীর অরণ্যে বা জলাভূমিতে পলায়ন করিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ তাহাদের বাসভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

সিয়াল (Sials) সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা ঝাঙ্গ, লেয়িয়া ও চুনিয়াট প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সর্ব্বপ্রথমে ইহাদিগকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। সিয়ালদের নায়ক আহম্মদ খাঁ

বাৎসরিক ষাট সহস্র মুদ্রা নিষ্ক্রয়রূপে প্রদান করিয়া তিন বৎসর রক্ষা পাইয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষে সম্প্রদায়টি রণজিতের শাসনাধীন হইল।

তিওয়ান (Tiwans) সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অত্যন্ত শক্তিশালী। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে খাঁ বেগ খাঁ নামক ঐ সম্প্রদায়ের নায়ককে রণজিৎ বন্দী করেন। সহোদর ভ্রাতার সহিত খাঁবেগের পরম শত্রুতা ছিল। রণজিৎ তাঁহাকে সহোদরের হস্তে অর্পণ করেন। খাঁবেগ ভ্রাতার হস্তে নিহত হইলেন। রণজিৎ শক্তিশালী তিওয়ানদিগকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করিতে সহসা সাহসী হইলেন না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তিওয়ানদের নুরপুর (Nurpur) দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গ রণজিতের হস্তগত হইল; তিওয়ান-নায়ক আহম্মদ ইয়ার খাঁ (Ahmád Yár Khán) আরও কিছুকাল তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের প্রভু রহিলেন। মাঙ্কেরার (Mánkera) নবাবের সহিত ইয়ারখাঁর ভীষণ শত্রুতা ছিল। রণজিৎ ঐ নবাবের সাহায্যে অল্পদিন মধ্যে তিওয়ানদের রাজ্য অধিকার করিলেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মাঙ্কেরার নবাব হাফিজ আহম্মদ খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে তিওয়ানেরা পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত মহারাজের সৈন্যদলভুক্ত হইল। রণজিতের পক্ষে মাঙ্কেরা জয় করা বড় অনায়াস-সাধ্য হয় নাই। উক্ত রাজ্য মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত, এবং চারিদিকে বারটা দুর্গ ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। মহারাজ রণজিতের অধ্যবসায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়াছিল। পঁচিশ দিন অবরোধের পর নবাব রণজিতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি রণজিতের অধীনতা স্বীকার করিয়া ডেরাইস্মাইল খাঁর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তিওয়ানেরা এমন বীরত্ব দেখাইয়াছিল যে, রণজিৎ পঞ্চাশজন তিওয়ানকে আপনার দেহ-রক্ষক নিযুক্ত করিয়া লাহোরে লইয়া আসেন।

লাহোরের পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী কসুরনগর পাঠানজাতীয় এক মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শিখদের সহিত লড়াই করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। লাহোর অধিকার-কালে তাহারা মহারাজ রণজিতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। রণজিৎ বহুবার তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমস্ত সৈন্যবল-সহ কসুরের নবাব কুতুবদ্দীনকে আক্রমণ করেন। সুদাকৌঁউড় এইযুদ্ধে রণজিৎকে সাহায্য করেন। তাঁহার বুদ্ধিবলে কুতুবুদ্দীন স্বীয় রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন। তিনি শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র জনপদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

থক্কর নামক মুসলমানসম্প্রদায় বীরত্বের নিমিত্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীর দীর্ঘকাল ইহাদের শাসনাধীন ছিল। মহারাজ রণজিতের সুযোগ্য-সেনা-নায়ক বুধাসিংহ ও জম্বুরাজ গোলাপ-সিংহের চেষ্টার ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে থক্করেরা রণজিতের বশ্যতা স্বীকার করে।

আওয়ান (Awans) সম্প্রদায় কখনো শিখদের প্রতিকূলে উগ্রভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই। আটকযুদ্ধের সময়ে ইহারা মহারাজ রণজিতের শত্রু-সৈন্যদিগকে আশ্রয় দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরাধে সেনাপতি মোকমচাঁদ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদের প্রধান জনপদ খ্যামসাবাদ ধ্বংস করেন। কিন্তু ইহারা ইহাদের পৈতৃক বাসভূমি রাওলপিণ্ডি, ঝেলাম ও সাহপুর হইতে বিতাড়িত হয় নাই। মহারাজ রণজিৎকে করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া ইহারা রণজিতের আশ্রয় পাইয়াছিল। জঞ্জোয়া (Janjoahs) সম্প্রদায় মহাসিংহের সময় হইতেই শিখদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

চিব (Chibs) সম্প্রদায়ের মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষ রাজপুত। কাঙ্গ্রা, জম্বু ও গুজরাট জেলায় তাহাদের নিবাস। ভাঙ্গী-সর্দ্দারেরা ও রণজিতের পিতা মহাসিংহ তাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ চিবদের নায়ক রাজা অমরখাঁর দুইটা দুর্গ আক্রমণ করেন। অমরখাঁ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার অল্প কয়েক মাস পরে অমরের মৃত্যু হইবামাত্র রণজিৎ তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

ঐ বৎসরেই রণজিৎ সুহিওয়ালজনপদের (Suhiwal) বলাক (Balach) সম্প্রদায়ের নায়ক ফতেখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ফতেখাঁ খুব বিক্রমশালী ব্যক্তি। ভাঙ্গীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত হয় এবং ইনি ভাঙ্গীদের অধিকৃত কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। ইনি রণজিতের পিতার নিকট হার মানিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ করদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ প্রথমে তাঁহাকে নানারূপে ভয় দেখাইয়া কর বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। ফতেখাঁ প্রতিশ্রুত কর অনিয়মিতরূপে দিতেন বলিয়া রণজিৎ সহসা তাঁহার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ফতেখাঁকে লাহোরে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে একখণ্ড জায়গীর দিলেন। কয়েক বছর তিনি লাহোরদরবারে ছিলেন। অবশেষে পরাধীন জীবনের দুঃসহ বেদনায় পীড়িত হইয়া তিনি লাহোরদরবার হইতে পলায়ন করেন। কিছুদিন এখানে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বহাওয়ালপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে রণজিৎ একে একে মুসলমান-সম্প্রদায়গুলিকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করিয়া সিন্ধুহইতে শতদ্রুপর্য্যন্ত সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইংরাজ ও রণজিৎ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন শক্তিশালী রণজিৎ সিংহ পঞ্চনদ প্রদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তখন ইংরাজ বঙ্গদেশ, বারাণসী, অযোধ্যা, কানপুর, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশ: তাহাদের আধিপত্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত করিতেছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, একদা মহাবীর রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্রের কিয়দংশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ঐ রঞ্জিত ভূভাগ ইংরাজদের অধিকৃত। দূরদর্শী রণজিৎ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"সব লাল হো যাএগা অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষই উত্তরকালে ইংরাজ-শাসনাধীন হইবে।" তাঁহার এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাজ্যবিস্তারসূত্রে ক্রমে ইংরাজ ও শিখ এই দুই শক্তিকে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি জটিল—মোগলরাজ্যের কঙ্কাল লইয়া তখন ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা শক্তির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। এই সংঘর্ষের মধ্যে ইংরাজেরা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মারাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজধানী দিল্লী নগরী অধিকার করিয়া লইল। ১লা নবেম্বর মারাঠারা পুনর্ব্বার লাসোয়ারির যুদ্ধে পরাজ

দ্বাদশ অধ্যায়

ইংরাজ ও রণজিৎ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন শক্তিশালী রণজিৎ সিংহ পঞ্চনদ প্রদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তখন ইংরাজ বঙ্গদেশ, বারাণসী, অযোধ্যা, কানপুর, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশ: তাহাদের আধিপত্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত .করিতেছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, একদা মহাবীর রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্রের কিয়দংশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ঐ রঞ্জিত ভূভাগ ইংরাজদের অধিকৃত। দূরদর্শী রণজিৎ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"সব লাল হো যাএগা অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষই উত্তরকালে ইংরাজ-শাসনাধীন হইবে।" তাঁহার এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাজ্যবিস্তারসূত্রে ক্রমে ইংরাজ ও শিখ এই দুই শক্তিকে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি জটিল—মোগলরাজ্যের কঙ্কাল লইয়া তখন ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা শক্তির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। এই সংঘর্ষের মধ্যে ইংরাজেরা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মারাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজধানী দিল্লী নগরী অধিকার করিয়া লইল। ১লা নবেম্বর মারাঠারা পুনর্ব্বার লাসোয়ারির যুদ্ধে পরাস্ত হইল। মারাঠা-নায়ক শিন্দে হীন সর্ত্তে ইংরাজের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ

হইলেন। শতদ্রুনদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী কোনো কোনো শিখনায়ক এই সময়ে মারাঠাদের সহিত যোগদান করিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শিখনায়কেরা পুনঃ পুনঃ ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর কর্ণেল বারন তাহাদিগকে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঝিন্দের রাজা ভাগসিং ও কৈথালের ভাই লাল সিং এই সময়ে ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, অধিকাংশ শিখনায়কই শতদ্রুর উত্তরতীরে আশ্রয় লইলেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যশোবন্ত রাও হোলকার কর্ণেল মনসনের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া সসৈন্যে দিল্লী অবরোধ করেন। কর্ণেল অক্টারলনি ও কর্ণেল বারনের সহিত সংগ্রামে তিনি পরাজিত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী মারাঠাদের প্রতি বিমুখ হইলেন—দুইমাস পরে তাহারা আবার ফতেগড় ও ডিগের যুদ্ধে হারিয়া গেল—মারাঠানায়ক হোল্‌কার সৈন্যবল হারাইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যসংগ্রহ-মানসে শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী শিখপ্রদেশে গমন করেন। ছয়মাস কাল তিনি পাতিয়ালায় ছিলেন, সেখানকার মহারাজা তাঁহাকে সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। এই অঞ্চলের অপর কোনো শিখনায়কও তাঁহাকে সাহায্যপ্রদানে অগ্রসর হইলেন না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড লেক আবার বিপন্ন হোল্‌কারকে আক্রমণ করিলেন; তিনি ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক অমৃতসরনগরে গমন করেন এবং মহারাজ রণজিৎসিংহের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তেজস্বী রণজিৎ শরণাগত হোল্‌কারকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেক্টর মারকুইস অব ওয়েলেসলির রাজ্যবিস্তার নীতির বিরোধী হইলেন—তাঁহারা ক্রুদ্ধ

রাজ্যপ্রসার বিপজ্জনক মনে করিয়া ধীরপ্রকৃতি লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। নূতন গবর্ণর জেনারেল হোল্‌কারের সহিত সন্ধি করিলেন। মহারাজ রণজিতের সহিতও মৌখিক চুক্তি হইয়া রহিল যে, তিনি হোল্‌কারকে কোনোরূপ সাহায্য করিবেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত রহিলেন যে, রণজিৎ ইংরাজের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান না করিলে, তাঁহারা কখনো শিখরাজ্য আক্রমণ করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তে রণজিতের রাজ্যবিস্তারকল্পনা কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইল। শতদ্রুর উভয়তীরের শিখদিগকে এক শাসন-সূত্রে বাঁধিয়া তিনি অখণ্ড স্বাধীনরাষ্ট্র-গঠনে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাঁহার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন।

শতদ্রুর দক্ষিণতীরে রাজ্যবিস্তারবাসনা রণজিৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যখন পাতিয়ালার মহারাজের সহিত ঝিন্দের রাজার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সেই বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য রণজিৎ 'মধ্যস্থরূপে' আহূত হইয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে শতদ্রু অতিক্রম করিলেন জানিয়া ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট কায়নালের সৈন্যবল বৃদ্ধি করিলেন। রণজিৎ এই সময়ে কতগুলি স্থান অধিকার করিয়া আপনার অনুগত বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবৎসরও তিনি সসৈন্যে পাতিয়ালায় গমন করিয়াছিলেন। এবারেও ফিরিবার সময়ে তিনি দুই একটা স্থান জয় করিয়া সহচরদিগকে প্রদান করেন।

শতদ্রুর দক্ষিণ তীরের নায়কগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রণজিৎ তাহাদের রাজ্য যেমন করিয়া হউক গ্রাস করিতে অভিলাষী হইয়াছেন,

আত্মশক্তিবলে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। রণজিতের শাসনাধীন হওয়া অপেক্ষা তাঁহারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন। ঝিন্দের রাজা, কৈথালের সর্দ্দার ও পাতিয়ালামহারাজের প্রতিনিধি একসঙ্গে দিল্লীনগরে গমন করিয়া ইংরাজের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। ইংরাজেরা শিখনায়কদিগকে অভয় প্রদান করিল কিন্তু সহসা রণজিতের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইল না।

ইংরাজেরা এই সময়ে ফরাসীবীর নেপোলিয়নের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকের মনেই এই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, জিগীষু নেপোলিয়ন ভারতবর্ষের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া আছেন। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা অবিলম্বে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ ও পারস্যের সাহের সহিত সন্ধিসংস্থাপন একান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। ইংরাজপক্ষ হইতে মেটকাফ সাহেব রণজিতের নিকট এবং এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কাবুলদরবারে প্রেরিত হইলেন।

এই সময়ে রণজিৎ কসুর নগরে অবস্থান করিতেছিলেন—শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী শিখনায়কেরা ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করায় তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইয়া আপনার সৈন্যবল বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ-দূত তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। তীক্ষ্ণ-ধী রণজিৎ ইংরাজের ফরাসী-ভীতি এবং নিজের অবস্থা উভয়ই সম্যক্ বুঝিতেন। তিনি জানিতেন, শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় ইংরাজ বিরোধী হইয়াছে, এবং তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমা লইয়া আফগানদের সহিত লড়াই চলিতেছে; অধিকন্তু তাঁহার ভুজবলে যে সকল শিখনায়ক বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন তাহারাও তাঁহার অনিশ্চিত বন্ধু। এই সব

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অখণ্ড শিখরাজ্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল।

যথাসময়ে মেটকাফ রণজিতের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংরাজ ও রণজিৎ উভয়ের পরম শত্রু ফরাসীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে রণজিৎ যেন ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। রণজিৎ আপনার সঙ্কট বুঝিয়াও ইংরাজদের ফরাসী-ভীতির সুযোগগ্রহণের চেষ্টা পাইলেন। তিনি জানাইলেন, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শতদ্রুর উভয়তীরবর্ত্তী শিখরাজ্যের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলে, এই সন্ধিতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই। মেটকাফ দেখিলেন, রণজিৎ ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে অভিলাষী নহেন, কারণ তাঁহার দাবী ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট কোনোকালে গ্রাহ্য করিবেন না। তিনি রণজিতের হস্তে প্রস্তাবের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া তাঁহার দৌত্য-কার্য্য শেষ করিলেন। মহারাজ রণজিৎও একখানি প্রস্তাবপত্রিকা প্রদান করিলেন। তাহাতে দুইটি দাবী ছিল;—প্রথম তাঁহাকে শতদ্রুর উভয়-তীরবর্ত্তী শিখরাজ্যের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; দ্বিতীয় কাবুলের সহিত তাঁহার যুদ্ধব্যাপারে ইংরাজ কোনোরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

মহারাজ রণজিৎ সন্ধির প্রস্তাবের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। তিনি ইংরাজদূতের উপস্থিতিসময়েই সসৈন্যে শতদ্রু পার হইয়া রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি আম্বালা ও লুধিয়ানা অধিকার এবং পাতিয়ালার মহারাজের সহিত শিরোপা বিনিময় করিয়া মৈত্রী স্থাপন করেন।

মেটকাফ সাহেব কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের সমীপে রণজিতের

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে এই সময়ের মধ্যে ইংরাজদের ফরাসীভীতি দূর হইয়াছিল, সুতরাং গবর্ণর জেনারেল রণজিতের সহিত হীনসর্ত্তে সন্ধি করিতে কোনোক্রমে সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু তিনি শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী শিখপ্রদেশ দাবী করিয়া রণজিৎকে জানাইলেন —"ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মারাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন; মারাঠাদের সহিত বিরোধকালে মহারাজই শতদ্রুনদী ইংরাজরাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; ইংরাজগবর্ণমেণ্ট শতদ্রুতীরের শিখনায়কদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, মহারাজ দক্ষিণ তীরে যে যে স্থান জয় করিয়াছেন ইংরাজগবর্ণমেণ্টকে সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণতীর হইতে সৈন্যনিবাস তুলিয়া লউন, ইংরাজদূতকে মহারাজ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, সন্ধির প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়া মহারাজ শিষ্টতা লঙ্ঘন করিয়াছেন।"

১০ই ডিসেম্বর তারিখে মেটকাফ সাহেব লাহোর নগরে মহারাজের সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারকালে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য গবর্ণর জেনারেলের প্রত্যুত্তর তাঁহাকে গভীর মনোবেদনা প্রদান করিল। তিনি বলিলেন—"আমি জানিতাম ফরাসীদের ভয়ে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট আমার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি সেটা কথার কথা মাত্র, তাঁহারা আমারই রাজ্যবিস্তারে বাধাপ্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।" রণজিতের চির-পোষিত উচ্চাভিলাষ পরিপূরণের পথে প্রবল বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষোভে, দুঃখে তিনি সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না, ইংরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। গোবিন্দগড় খাদ্যে ও যুদ্ধোপকরণে

পরিপূর্ণ হইল, সেনাপতি মোকমচাঁদ কাঙ্গ্রা হইতে আহূত হইয়া সসৈন্যে ফিলোর দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ও দিকে ইংরাজপক্ষেও আয়োজন চলিতেছিল। অক্টারলনি ইংরাজ-সৈন্যসহ শতদ্রুতীরে আগমন করিলেন।

নাজিরুদ্দীনপ্রমুখ রণজিতের হিতৈষী প্রবীণ বন্ধুরা তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে রণজিৎ ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেল তারিখে তিনি ফরিদকোট ছাড়িয়া দিলেন এবং আম্বালা হইতে সেনানিবাস তুলিয়া লইলেন। ২৫এ এপ্রেল তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, ৩০এ মে তারিখে গবর্ণর জেনারেল তাহা অনুমোদন করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে শতদ্রু ইংরাজরাজ্যের সীমা হইল। রণজিৎ ইংরাজের শত্রুর সহিত যোগদান না করিলে ইংরাজ রণজিতের রাজ্য কখনো অধিকার করিবেন না। এই সন্ধিসংস্থাপনের পর হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত একদিনের জন্যও রণজিৎ ইংরাজের সহিত কোনো কারণে বিরোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মহারাজ রণজিৎকে তাঁহাদের প্রধান সুহৃদ ও সহায় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রণজিৎ ও তাঁহার সহযোগিগণ

পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিতের কীর্ত্তিকথা আজিও পঞ্চনদ-প্রদেশের গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সত্তর বৎসর হইল, তিনি

মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আজিও ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার আলেখ্য দৃষ্ট হয়। রণজিতের শৈশব ও যৌবনকালের কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। বোধকরি তাঁহার শিশুকালে ও যৌবনে পাঞ্জাবে চিত্রবিদ্যার তেমন আদর ছিল না। চিন্তা-জর্জ্জরিত, ভগ্ন-হৃদয় বৃদ্ধ রণজিতের প্রতিকৃতিই শিখদের আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

বীরবর রণজিৎ দৈহিক লাবণ্যে বঞ্চিত ছিলেন ; তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভার ছাপ না থাকিলে কোনো দর্শক তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন না। শৈশবে ভীষণ-বসন্তব্যাধি তাঁহার বাম চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার ধূসর-পিঙ্গল মুখ-চর্ম্মের উপর গভীর কাল দাগ পড়ায় স্বভাব-কুৎসিত-মুখশ্রী অধিকতর কুৎসিত হইয়াছিল। খর্ব্বাকৃতি রণজিতের সরল-ক্ষুদ্র নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল, পুরু অধর ও ওষ্ঠ সুদৃঢ়-দন্তপঙ্ক্তি চাপিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার ধূসর শ্মশ্রুরাজি আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় নাভিপর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া মুখশ্রীতে গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছিল। রণজিতের একমাত্র দক্ষিণচক্ষু সুবৃহৎ ও দীপ্তি-পূর্ণ ছিল ; যখন কোনোকারণে তিনি উত্তেজিত হইতেন তখন তাঁহার সেই জ্বলজ্বল চক্ষু হইতে যেন তেজ ও দৃঢ়তা ঠিকরিয়া পড়িত। তাঁহার হাসি লোকের মন ভুলাইতে পারিত। যুক্তিপূর্ণ সোজা কথায় অতি জটিল প্রশ্নের আশু মীমাংসা করিয়া দিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন।

বালকবয়সেই রণজিতের রণ-পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, শাসনদক্ষতা ও মন্ত্রণা-কুশলতা শিখদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বার বৎসর বয়সে যখন তিনি পিতৃ-সম্পদের অধিকারী হইলেন তখন চারিদিক হইতে অনিশ্চিত বন্ধু, প্রতারক সহযোগী ও প্রকাশ্য শত্রুগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। সেই ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি প্রধানতঃ আপনার ভুজবল ও বুদ্ধিমত্তাকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোনো

দিন বিদ্যাশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন নাই; পুস্তক পাঠ করিয়া বা কোনো গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া তিনি কোনো বিদ্যা লাভ করেন নাই; তথাপি স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি পঞ্চনদপ্রদেশে স্বাধীন শিখ-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার যোগ্যতালাভ করিয়াছিলেন। রাজোচিত গুণগ্রাম লইয়া তিনি যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান বারন্স (Captain Burnes) ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের পক্ষ হইতে উপহার ও পত্র লইয়া মহারাজ রণজিতের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কাপ্তান রণজিতের সহিত আলাপ করিয়া বিস্মিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন—"ভারতবর্ষের আর কোনো ভূপতি আমার মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই; ইনি নিরক্ষর হইয়াও যেমন উৎসাহ, তেজস্বিতা ও দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিতেছেন, ভারতবর্ষের অপর কোনো ভূপতির এমন ক্ষমতা নাই।"

স্বয়ং কৃত-বিদ্য না হইলেও তিনি বিদ্বানের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা দেখাইতে বিরত হইতেন না। তাঁহার দরবারে অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি স্থান পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া লইতেন। পণ্ডিতদিগের বাক্য গভীর অভিনিবেশ-সহকারে শুনিতেন এবং আলোচ্য বিষয়ে স্বয়ং নানারূপপ্রশ্ন করিতেন। তাঁহার অনন্যসুলভ অনুসন্ধিৎসাদর্শনে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইতেন। তিনি যাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন এবং নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। কাপ্তান বারন্স বলেন—"তাঁহার প্রশ্নগুলি নৈশ দুঃস্বপ্নের মত মানুষকে চাপিয়া ধরিত। ভারতীয় নরপতিগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জিজ্ঞাসু আর কেহ নাই। তিনি আমাকে রাজ্য-রাজা

দেশ-জাতি, স্বর্গ-নরক, দৈত্য-দানব, ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ক শত শত প্রশ্ন করিয়াছিলেন।" অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও মনে সন্দেহ আসিবামাত্র তিনি সেই সন্দেহনিরাকরণের চেষ্টা পাইতেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহার নাড়ীপরীক্ষার সময়ে ঘটিকাযন্ত্র, তাপপরীক্ষার সময়ে তাপমানযন্ত্র কেন ব্যবহার করিলেন না, তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিতেন না।

শিশুবয়সেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, পিতার সাহচর্য্যে যুদ্ধবিদ্যায় তিনি কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন; ক্রমে আপনার শক্তিবলে তিনি বাল্যেই অসাধারণ যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। যুদ্ধক্ষেত্র তাঁহার নিকট ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ বলিয়া মনে হইত। যুদ্ধব্যাপারে এবং যুদ্ধশাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যেমন আনন্দ লাভ করিতেন পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই এমন সুখানুভব করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। তিনি সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন, সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। তাঁহার অশ্বশালে ভারতবর্ষ, আরব ও পারস্যদেশের বাছাবাছা উৎকৃষ্ট অশ্ব দেখা যাইত। বিবিধ অস্ত্রচালনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। রাজ-দরবারে যাইবার সময়ে রণজিৎ মণিমাণিক্য-খচিত মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু বেশভূষার আড়ম্বর তাঁহার ভাল লাগিত না। যখন তিনি সাধারণ আবরণে সজ্জিত হইয়া সভাসদ্-গণের সহিত আলাপ করিতেন তখনো তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শকদের নিকট তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া সপ্রমাণ করিত।

যে সকল গুণের অধিকারী হইলে সংগ্রামময় কর্ম্মক্ষেত্রের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্য লাভ করা যায় বীরকেশরী রণজিৎ স্বভাবতই সেই গুণগুলিতে ভূষিত ছিলেন. এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে

না। যে সকল নৈতিক গুণে অলঙ্কৃত হইলে লোকে শীলবান্ বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে সেই সকল স্পৃহনীয় সদ্‌গুণে বঞ্চিত হইয়াও অনন্যসুলভ প্রতিভাবলেই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বীরোচিত গুণগ্রামে তিনি যেমন উন্নত ছিলেন নৈতিক চরিত্রে তিনি তেমনি অবনত ছিলেন। স্বার্থপরতা, মদ্যাসক্তি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা তাঁহার নৈতিক জীবন চিরম্লান করিয়া রাখিয়াছিল। অত্যুগ্র প্রতিভাবলে তিনি জাতীয় মহাবীররূপে শিখদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সকল লোকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাতব্যাধি যখন মহারাজকে স্থবির করিয়াছিল তখনো শিখসর্দ্দার ও ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না। অসীম সাহস ও অদম্য অধ্যবসায় তাঁহার চরিত্রে মিলিত হইয়াছিল। ব্যর্থমনোরথ হইবার আশঙ্কায় তিনি কোনো দিন কোনো কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, এমন অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারে না। তাঁহার সমগ্র জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যয়িত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কদাচ ভীত বা হতবুদ্ধি হইয়াছেন এমন কথা তাঁহার শত্রুর মুখেও শোনা যায় নাই।

যে সমাজে রণজিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার মত ধর্ম্মবল ও শিক্ষা তাঁহার ছিল না। অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্যে পড়িয়া তিনি চরিত্রসম্পদে ধনী হইতে পারেন নাই। চরিত্রবান্ বলিয়া তিনি কদাচ পূজা পাইবেন না, বীর বলিয়া চিরদিন আদৃত হইবেন।

উপযুক্ত সহযোগী নির্ব্বাচন করিয়া রণজিৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সহযোগীরা তাঁহাকে রাষ্ট্রগঠনে ও শাসনদণ্ড-পরিচালনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। কর্ম্মচারিনিয়োগ-সম্বন্ধে রণজিৎ উদারতারই

পরিচয় দিয়াছেন; মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতি তাঁহার কোনো বিদ্বেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিচারে সর্ব্বসম্প্রদায়ের গুণীরা তাঁহার দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন। মুসলমান-রাজশক্তি শিখধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর হইতেই নব ধর্ম্মটিকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা পাইয়াছিল বলিয়া মুসলমান ও শিখ পরস্পরকে ঘৃণা করিত। হরগোবিন্দ-প্রমুখ শিখগুরুদের শাসনকালে এই বিদ্বেষবুদ্ধি এমন উগ্রভাব ধারণ করিয়াছিল যে, শিখেরা তখন মুসলমানকে অভিবাদন, মুসলমানের সহিত কোনোসূত্রে বিন্দুমাত্র যোগরক্ষা অধর্ম্ম বিবেচনা করিত। শেষগুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে মুসলমানশাসনের উচ্ছেদ-সাধনার্থ কঠোর সংগ্রাম করিলেও তিনি এই সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে বহু মুসলমান সৈনিকের কার্য্য করিত। তাঁহারও বিরুদ্ধে গ্রিফিন সাহেব এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, তিনিও মুসলমানকে সম্মানজনক পদপ্রদানের বিরোধী ছিলেন। গ্রিফিন সাহেবের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক কোনো যুক্তি আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

মহারাজ রণজিতের রাজত্বে শাসন ও বিচারবিভাগের উচ্চপদগুলি মুসলমান ও ব্রাহ্মণেরাই পাইয়াছিলেন। শিখসর্দ্দারদিগকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত না করিবার পক্ষে একটি হেতুও ছিল। রণজিতের সময়ে শিখেরা ভূমিকর্ষণে ও অসিচালনে যেমন দক্ষ ছিল, শাসনকার্য্যে তাহারা তেমনি অজ্ঞ ছিল। দুই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কোনোরূপ শিক্ষা না পাইয়াও শাসনদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা পারে না। ভারতবর্ষীয় মুসলমান এবং হিন্দুরা দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা অল্পাধিক শাসনক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। রণজিতের সময়ে শিখদিগের উক্তরূপ

স্বাভাবিক শাসনক্ষমতাসম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মহারাজ রণজিৎ তাঁহার জীবনের প্রথমভাগেই শিখদিগের উক্তরূপ অক্ষমতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং সর্দ্দার ফতে সিংহও মৃত্যুকালে রণজিৎকে বলিয়াছিলেন—"আপনি জাঠ-শিখদিগকে কখনো দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবেন না, সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিবার যোগ্যতা তাহাদের আছে শাসনকার্য্যে মুসলমান, রাজপুত ও ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিবেন।"

যে সকল সহযোগীর সদুপদেশ ও কর্ম্মকুশলতা মহারাজ রণজিৎকে বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সেই সকল সহযোগীর মধ্যে ফকির আজিজুদ্দীন সর্ব্বপ্রধান। তিনি লাহোরদরবারের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। তাঁহার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া মহারাজ কখনো কোনো গুরুতর কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতেন না। আজিজুদ্দীনের পরামর্শেই তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

বোথারার কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশে ফকিরের জন্ম। লাহোর নগরে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগর অধিকারের পরে মহারাজ রণজিৎ চক্ষুপীড়ায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, নগরের প্রধান চিকিৎসক মহাশয়ের আদেশে তাঁহার শিষ্য আজিজুদ্দীন রণজিতের সেবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেবকের কর্ম্মতৎপরতায় ও নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে কয়েকখানি গ্রাম বৃত্তিদান করিয়া আপনার চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই ফকির লাহোরদরবারে স্থান পাইলেন এবং রণজিতের রাজৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্ষমতা ও সম্পদ বাড়িতেছিল।

চরিত্রগুণে অচিরে ফকির রণজিতের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। মহারাজ যখন তাঁহার প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে লইয়া

রাজধানী হইতে দূরে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন আজিজুদ্দীনের উপর রাজধানীরক্ষার ভার অর্পিত হইত। কখনো কখনো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রেরিত হইয়াছেন। দায়িত্বপূর্ণ দৌত্যকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তিনি অনেক বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আমীর দোস্ত মহম্মদের নিকট তিনি দূতরূপে গমন করেন। গবর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক ও অকল্যাণ্ডের সহিত ১৮৩১ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে রূপুরে ও ফেরোজপুরে রণজিতের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই সাক্ষাৎকারকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কার্য্যের ভার আজিজুদ্দীনকে লইতে হইয়াছিল। মহারাজের সভাসদ্গণের মধ্যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও চরিত্রবলে তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধীরপ্রকৃতি পরামর্শদাতার উপদেশ দ্বারা তিনি চালিত হইতেন বলিয়াই তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে শিখদের সহিত ইংরাজদের কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

দরবারে আজিজুদ্দীনের অসামান্য ক্ষমতা ছিল—তাঁহার সৌভাগ্য অনেক হিংসাপরায়ণ সভাসদের মনে ঈর্ষানল জ্বালাইয়া দিয়াছিল—কিন্তু আজিজুদ্দীনের চরিত্রে এমন আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে, কেহ কখনো তাঁহার প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়ায় নাই। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মমতের উদারতার জন্যই ফকির লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমান, অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমানকবি ও দার্শনিক এই শ্রেণীভুক্ত। সাম্প্রদায়িকতা ফকিরের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে নাই। গোঁড়া মুসলমানদের মত তিনি কোরাণের সূত্রগুলিকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। একদিন মহারাজ রণজিৎ ফকিরকে প্রশ্ন করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? ফকির উত্তর করিলেন:—"আমি দিগন্তপ্রসারিত একটা

বিশাল নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয়দিকে তাকাইতেছি কোনোদিকে কূল কিনারা দেখিতেছি না।” ফকির উক্ত বাক্যদ্বারা উভয় ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইলেন।

আজিজুদ্দীন তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কবি ও বক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। প্রাচ্য-সাহিত্য-বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য তিনি আপন ব্যয়ে লাহোর নগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বীয় বিদ্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাজকীয় দলিলগুলি ভাষার মাধুর্য্য ও বাক্যবিন্যাসের শিষ্টতায় আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত।

লাহোরদরবারের অধিকাংশ সভাসদেরই ব্যবহারে রূঢ়তা ছিল। তাঁহাদের মধ্যস্থিত এই মার্জ্জিতরুচি শান্তগম্ভীর ফকিরের বিনয়গুণে আগন্তুকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন।

অনেক প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ও রাজপুরুষ মুক্তকণ্ঠে ফকির আজিজুদ্দীনকে প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৫-৩৬ অব্দে ব্যারণ চার্লস হুগেল পঞ্চনদপ্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—“ফকির আমার মনের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।” ফেরোজপুরের দরবারে লর্ড এলেনবরা প্রকাশ্য সভার মধ্যে ফকিরকে নিজের জেব ঘড়ি উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে শিখ ও ইংরাজগবর্ণমেণ্টের শান্তিরক্ষক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফকির মৃত্যুশয্যাতেও শিখসৈন্যদিগকে শতদ্রু পার হইতে নিষেধ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের অল্পপূর্ব্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদরও লাহোর-দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিতের রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ধ্যানসিংহ সর্ব্বপ্রধান

ছিলেন। তিনি হিন্দু রাজপুত। তাঁহার সহোদর রাজা গোলাপ সিংহ ও সুচেত সিংহ দুইজনেই লাহোরদরবারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ধ্যানসিংহ প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন এবং অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি এমন সুবিবেচনার সহিত ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন যে, সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কাহারো সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে ধ্যানসিংহ যখন তাঁহার অন্য দুই সহোদরকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইতেন তখন কোনো প্রবল শত্রুও তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। রণজিৎ তাঁহার এই বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে সমুচিত শ্রদ্ধা দেখাইতেন এবং 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ধ্যানসিংহের সম্বন্ধে রণজিৎ স্বয়ং বলিয়াছেন —"রাজা প্রিয়দর্শন, উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, অসি, বর্শা ও বন্দুক চালনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি আগন্তুকদিগের সহিত শিষ্টব্যবহার করেন ও প্রার্থীদের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার নিমিত্ত সতত উৎসুক।"

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ধ্যানসিংহ পরম অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন। রণজিতের মৃত্যুর পরে লাহোররাজপরিবারে যে ভীষণ আত্মদ্রোহ ঘটিয়াছিল ধ্যানসিংহ তাহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারই ষড়যন্ত্রে খড়্গসিংহ, নাওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ নিহত হইয়াছিলেন মনে করিয়া আজপর্য্যন্ত শিখেরা ধ্যানসিংহকে পরমপাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

জমাদার কুশলসিংহ লাহোর দরবারের এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মীরাট সহরের এক ব্রাহ্মণ-দোকানদারের পুত্র, ১৭ বৎসর বয়সে লাহোর নগরে আসিয়া পাঁচ টাকা বেতনে সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে রাজভবনের কয়েকজন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়, তাঁহাদের সহায়তায় তিনি মহারাজ রণজিতের শরীর-

রক্ষক নিযুক্ত হন। তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন না হইয়া কেবলমাত্র নিজের কর্ম্মতৎপরতায় তিনি ক্রমে রণজিতের প্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে জমাদার উপাধি প্রদান করিয়া রাজ-ভবনের দেউড়িওয়ালা নিযুক্ত করেন। রাজপুরীর যাবতীয় অনুষ্ঠানের ও দরবারের ব্যবস্থা-ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। উচ্চ নীচ সকল ব্যক্তিকে তাঁহার মধ্যস্থতায় রাজার সহিত পরিচিত হইতে হইত।

লাহোরে আগমনের পাঁচ বৎসর পরে কুশল শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। রাজদরবারে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার ক্ষমতার সাধু ব্যবহার করিতে পারেন নাই। উৎকোচগ্রহণ করিয়া তিনি অর্থশালী হইয়া উঠেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উপর কাশ্মীরের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। তথাকার দরিদ্র প্রজাদের উপর তিনি এমন উৎপীড়ন করেন যে, একবৎসরমধ্যে সেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল! লাহোরদরবারেও তাঁহার স্বেচ্ছা-চারিতা অনেককে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহাদের বীরত্ব রণজিতকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন হরি সিংহ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। যেমন সাহসিকতায় তেমনি সৈন্যপরিচালন-দক্ষতায় তিনি অপর সকল সেনাপতিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুলতান অধিকার করেন; কাশ্মীরবিজয়-কালেও তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ রণজিৎ তাঁহাকে কাশ্মীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেমন নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, শাসন-ক্ষেত্রে তেমন পারেন নাই। অল্পকালমধ্যে হরি সিংহ প্রজাদের অশ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া পড়েন। মহারাজ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে লাহোরে আহ্বান করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আফগানদের সহিত এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

রণজিতের জীবনের শেষভাগে রাজা দীননাথ খুব ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। কূটনীতিজ্ঞ দীননাথ রাজনৈতিকমত-বিরোধের মধ্যে সর্ব্বদা আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতেন। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও বিপন্ন হন নাই, বরং তাঁহার ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও শক্তি দিন দিন বাড়িতেছিল। দূরদর্শনবলে তিনি ভবিষ্যবিপদ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি পতনোন্মুখবন্ধুকে ত্যাগ করিতে কোনো দিন কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি প্রতারণার সাহায্যে ক্রমাগত বিপদ এড়াইয়া চলিতেন। স্বদেশকে তিনি ভালবাসিতেন না এমন নহে—কিন্তু তিনি চিরদিন স্বার্থকে স্বদেশপ্রীতির উপর স্থান দিয়াছেন। চরিত্রগত এই সব দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও তিনি স্বীয় অনন্যসুলভ কর্ম্মদক্ষতাগুণে রণজিতের প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত করেন। রণজিতের মৃত্যুপর্য্যন্ত তিনি বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ইংরাজেরা লাহোর নগর অধিকার করিবার পরে তিনি ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ইংরাজেরা শিশু মহারাজ দলিপসিংহের পক্ষ হইয়া যাঁহা-দিগকে রাজ্যচালনার ভার দিয়াছিলেন রাজা দীননাথ তাঁহাদের অন্যতম। দীননাথের ন্যায় একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে হাতে পাইয়া ইংরাজেরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহায়তা না পাইলে অনভিজ্ঞ ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা লাহোর-রাজ-সরকারের জটিলহিসাব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। শিখেরা রাজা দীননাথকে দেশদ্রোহী বলিয়া আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধান্তে রাজা

দীননাথের সহায়তায় ইংরাজেরা অনেক বিদ্রোহী শিখকে বন্দী ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত লেহ্না সিংহ লাহোর দরবারের অন্যতম ভূষণ। তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কামান তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত একটি ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে মাস, তিথি, তারিখ প্রভৃতি নির্ণয় করা যাইত। তিনি বহুভাষাবিৎপণ্ডিত ছিলেন, অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। মহারাজ তাঁহাকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তিনি লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার বিচারে কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব থাকিত না, প্রজাদের অবস্থাদি ভালরূপে বিচার করিয়া তিনি কর ধার্য্য করিতেন। প্রজাপীড়ন, উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি কোনো প্রকারের কলঙ্ক তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সাধু বলিয়া তাঁহাকে সকলে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রণজিৎ ও শিখসৈন্য

সৈন্যপরিচালনা অপেক্ষা সৈন্যদলগঠনেই রণজিতের সামরিক প্রতিভা বেশি প্রকাশ পাইয়াছিল। উদ্ধত-প্রকৃতি, স্বস্বপ্রধান, বিবাদরত জাঠশিখদিগকে তিনিই এক যুদ্ধ-কুশল-জাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শেষগুরু গোবিন্দসিংহের সময় হইতেই শিখেরা রণ-নৈপুণ্য লাভ করিতেছিল। খালসা সৈন্যদল তিনিই গঠন করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মরক্ষা ও গুরুর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাহাদিগকে একই ব্রতসাধনে নিরত রাখিত। গুরুর মৃত্যুর পরে ক্রমে তাহাদের এই ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। উপযুক্ত নায়কের অভাবে শিখ-বীরেরা স্বস্বপ্রধান ও লুণ্ঠনপরায়ণ হইয়া উঠে। খালসা নামে একটি সৈন্যদল ছিল বটে কিন্তু সে দলটি সুচালিত কিংবা সুশিক্ষিত ছিল না।

খালসা সৈন্যদলের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। অনভিজ্ঞ ও অক্ষমেরাই পদাতিকের কার্য্য করিত। যুদ্ধকালে অশ্বারোহীরা শত্রুদের সম্মুখীন হইত, পদাতিকেরা দূরে থাকিয়া শিশু ও রমণীদিগকে রক্ষা করিত অথবা দুর্গের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিত। অশ্বারোহীদের প্রধান অস্ত্র ছিল অসি, পদাতিকেরা তীরধনুক এবং কখনো কখনো সাধারণ পলিতাবন্দুক ব্যবহার করিত। অতি অল্প সময়েই বারুদের ব্যবহার করা হইত, এই জন্য খালসা সৈন্যেরা বন্দুক-যুদ্ধে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের যথেষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনমধ্যেই তিনি খালসা সৈন্যদলের দুর্ব্বলতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। বীরোচিত গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াও সুশিক্ষা ও শৃঙ্খলার অভাবে শিখসৈন্যেরা প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান-দিগের সহিত প্রকাশ্যযুদ্ধে সাহসী হইত না। য়ুরোপীয় যুদ্ধপ্রণালী রণজিৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি শিখদের প্রাচীনযুদ্ধপ্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে অভিনব য়ুরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষা-প্রদানে অভিলাষী হইলেন। সৈন্যদল গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট কয়েকজন সমরনিপুণ সেনানায়ক চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা লোকপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায়

তিনি স্বয়ং সুযোগক্রমে কয়েকজন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ যে কয়জন য়ুরোপীয় যোদ্ধাকে সহযোগিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রণদক্ষ এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধবিভাগেকার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধবিশারদ সেনানায়কগণের সহায়তায় রণজিতের বিজয়বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। স্বভাব-বীর শিখেরা অল্পদিন মধ্যে সুশিক্ষাগুণে সংযত, কষ্ট-সহিষ্ণু ও যুদ্ধ-কুশলসৈন্যে পরিণত হইল। শিখপদাতিকেরা যুদ্ধ-কৌশলে পৃথিবীর যে কোনো সুশিক্ষিত সৈন্য-দলের সমতুল্য হইয়া উঠিল। তাহারা যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইয়া প্রত্যহ ত্রিশ মাইল হিসাবে কুচ্ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিত।

পূর্ব্বে অনেক স্থানে বলা হইয়াছে, শিখ-অশ্বারোহীরা আফগানরাজাদের সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিত, খাদ্য ও অস্ত্রাদি লুণ্ঠন এবং পথরোধ করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। তখন তাহারা দ্রুতপলায়নে যতদূর দক্ষতা প্রকাশ করিত, যুদ্ধে তেমন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। রণজিতের সৈন্যদল শৌর্য্যবীর্য্যে, সাহসে ও সহিষ্ণুতায় য়ুরোপীয় সৈন্যদলের বিস্ময়োৎপাদন করিল। মহারাজের সৈন্যদলে পদাতিক সৈন্যেরাই প্রাধান্য লাভ করিল।

শিখেরা স্বভাবতঃ যুদ্ধানুরাগী ছিল বলিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে প্রবেশ করিত। রণজিৎকে জোর করিয়া কাহাকেও সৈন্য করিতে হয় নাই। পঞ্চনদপ্রদেশের বলবান্ ও রূপবান্ যুবকদের দ্বারাই তাঁহার পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে খালসা-পদাতিক-সৈন্যদলে একমাত্র আকালীরাই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মান্ধ ও দুর্দ্দান্ত সৈন্যদিগকে স্ববশে রাখিবার নিমিত্ত মহারাজ রণজিৎকে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার

করিতে হইয়াছে। ১৮০৯ অব্দে ইহারা ইংরাজদূত মেটকাফ সাহেবের মুসলমান সহচরদিগকে আক্রমণ করিয়া রণজিৎকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। অসমসাহসিক আকালীরা কোনো কোনো সঙ্কটের সময়ে আপনারা অগ্রগামী হইয়া শিখদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইহারা দুইবার মহারাজ রণজিতের জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

মুসলমানদের ডাকনামাজ শুনিলেই আকালীরা ক্ষেপিয়া উঠিত। রণজিৎ মুসলমানদিগকে বিন্দুমাত্র ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার শাসনে মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের বিশ্বাসানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে পারিত; আকালীদের ইহা সহ্য হইত না। এই ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়কে সংযম-সূত্রে বাঁধিবার মানসে রণজিৎ তিন সহস্র আকালী লইয়া একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল গড়িয়া তুলিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনো সুফল ফলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

যে কয়জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মহারাজ রণজিৎকে সৈন্যদল গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন সেনাপতি ভেন্‌টুরা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি ইতালীদেশবাসী, নেপোলিয়নের সৈন্যদলে কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। য়ুরোপখণ্ডের যুদ্ধাবসানে যখন সৈন্যবিভাগে তাঁহার চাকুরী ছিল না তখন প্রবাসে যে কোনো রাজ্যে সৈনিক-বৃত্তি-লাভের জন্য বাহির হইয়া পড়েন। সেনাপতি এলার্ডও ভেন্‌টুরার ন্যায় নেপোলিয়ানের অধীনে বহুযুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজনেই মিশরে ও পারস্যে সৈন্যবিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। তৎপরে হিরাত ও কান্দাহার হইয়া তাঁহারা পঞ্চনদপ্রদেশের রাজধানী লাহোর নগরে উপনীত হইলেন। মহারাজ রণজিৎ এই অজ্ঞাত-কুলশীল বিদেশীদ্বয়কে তাঁহার সৈন্যদলে নিযুক্ত করিতে দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ করিলেন: নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া রণজিৎ তাঁহাদিগের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার সহযোগী করিয়া সৈন্য-দল গড়িয়া তুলেন। এলার্ড একদল অশ্বারোহী সৈন্যের ও ভেন্টুরা 'ফৌজ খাস' নামক প্রসিদ্ধ সৈন্য-বিভাগের নায়কতা লাভ করেন। ফৌজখাসের সৈন্যেরা সুশিক্ষিত, সংযত-স্বভাব ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। চারিদল পদাতিক ও দুইদল অশ্বারোহী লইয়া মহারাজ এই সৈন্যবিভাগটি গঠন করিয়াছিলেন। সেনাপতি ভেন্টুরা তাঁহার সৈন্যবলসহ দীর্ঘকাল পেশবার প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী ভেন্টুরাকে চিরদিন যথোচিত সম্মান দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লাহোরের প্রধান বিচারক ও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কর্ণেল কোর্ট নামক এক ফরাসী বীর মহারাজ রণজিতের অধীনে দুইদল গুর্খাসৈন্যের চালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পারিস নগরের এক সামরিক বিদ্যালয়ে যুদ্ধশাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। কর্ণেল গার্ডনার নামক এক আইরিস, মহারাজের অনুগ্রহে আগ্নেয়াস্ত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত য়ুরোপীয়দিগকে সহায় করিয়া প্রতিভাশালী রণজিৎ একটি সমরকুশল জাতি গঠন করিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। রাজ্যবিজয়ের সময়ে তিনি কোনোদিনই বিদেশী কর্ম্মচারীদিগের উপর সৈন্যদলের সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করিতেন না; যুবরাজ খড়্গসিংহ, সেরসিংহ কিংবা কোনো প্রধান শিখসর্দ্দারের উপর বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হইত।

যে সকল স্বদেশীয় বীরের আনুকূল্য লাভ করিয়া রণজিৎ পরম উপকৃত হইয়াছিলেন দেওয়ান মোকমচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাজ্য-বিজয় ব্যাপারে তিনি রণজিতের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ১৮০৬-১৪

খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত তিনি শিখ-সৈন্য-দলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র রামদয়ালও সুদক্ষ সেনাপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অপ্রাপ্তবয়স্ক রামদয়াল হজারের যুদ্ধে নিহত হন। সেনাপতি মিশ্রচাঁদ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন; কাশ্মীর-জয়কালেও তিনি একদল সৈন্যের নায়ক ছিলেন। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন, তথাপি জাতিতে তিনি বৈশ্য ছিলেন বলিয়া অভিমানী শিখেরা তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইত না। শিখ-সর্দ্দারদিগের মধ্যে সর্দ্দার ফতেসিং কালিনওয়ালা ও সর্দ্দার নিহালসিং আত্তিরওয়ালা প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮০১ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত যাবতীয় যুদ্ধে তাঁহারা মহারাজ রণজিতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে সেনাপতি হরি সিংহের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তিনি অসমসাহসী সৈন্যচালক বলিয়া রণজিতের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

সেনাপতি ভেণ্টুরা মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পরেও কিছুকাল লাহোরে ছিলেন। শিখরাজ্যে যখন প্রবল অরাজকতা দেখা দিল সেই সময়ে ১৮৪৩ অব্দে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রণজিতের রাজ্যবিজয়

শিখসর্দ্দার ও মুসলমাননায়কদিগকে একে একে পরাভূত করিয়া কি কঠোর সংগ্রামের পর রণজিৎ পঞ্চনদপ্রদেশের আধিপত্য লাভ

করেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্জনদপ্রদেশবাসীরা তাঁহার বিস্ময়কর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিল। এইরূপে মহাবীর রণজিৎকে অবলম্বন করিয়া পঞ্চনদ-প্রদেশে একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। মহারাজ রণজিতের রাজ্য শতদ্রু হইতে খাইবার, মুলতান হইতে কাশ্মীরপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহাবীর রণজিতের মনে মুলতান-জয়ের বাসনা জাগিয়া উঠে। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদিরসাহ ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময় হইতে মুলতাননগর আফগানরাজাদের শাসনাধীন হয়। মাঝে ১৭৭১ হইতে ৭৯ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত কথনো কথনো ভাঙ্গী শিখসর্দ্দারেরা এই নগরের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন। আফগানরাজ তাইমুর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মুজফ্ফরখাঁকে ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। নবাব মুজাফ্ফর বীরপুরুষ হইলেও রণজিতের তুল্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমকক্ষভাবে যুদ্ধ চালাইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া রণজিৎ যখন মুলতানের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইতেছিলেন, বৃদ্ধ নবাব তখন প্রমাদ গণিলেন। তিনি স্বয়ং বিশ মাইল অগ্রসর হইয়া রণজিতের সহিত দেখা করেন এবং তাঁহাকে মহামূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিদায় করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ আবার মুলতান-অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। এ যাত্রাও অসহায় নবাব সত্তর সহস্র মুদ্রা দিয়া রক্ষা পাইলেন। এত অর্থ পাইয়াও রণজিতের বিজয়-লালসা প্রতিনিবৃত্ত হইল না, পরবৎসর তিনি মুলতান আক্রমণ করিয়া আংশিক জয় করিলেন। কিন্তু শিখবীর-গণের প্রাণ-পণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আফগানেরা দুর্গরক্ষাকার্য্যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিল। উভয় পক্ষে একটা রফা হওয়ার পরে যুদ্ধের অবসান হয়; রণজিৎ বিস্তর ধনরত্ন লাভ করেন।

ওদিকে আফগানরাজ সাহ সুজা নির্ব্বাসিত হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশে আইসেন। তিনিও একবার মুলতান-জয়ের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি এখন ঐ নিমিত্ত বীরকেশরী রণজিতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রণজিৎ হত-গৌরব সাহসুজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন কেন? তিনি স্বয়ং মুলতান জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিবার অভিলাষী হইলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৪ এ ফেব্রুয়ারী তিনি নগর অবরোধ করেন, পরদিন নগর তাঁহার করায়ত্ত হইল কিন্তু দুর্গ শত্রুদের হস্তে রহিয়া গেল। দুর্গজয়ের নিমিত্ত দীর্ঘকাল ব্যর্থ চেষ্টা চলিল, ভীষণ সংগ্রামে বহু শিখবীর জীবনত্যাগ করিল। অবশেষে শিখ-শিবিরে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন হওয়ায় শিখসৈন্যগণ হতোদ্যম হইয়া পড়িল। রণজিৎ অত্যন্ত মনোবেদনার সহিত অনিচ্ছায় সসৈন্যে মুলতান ত্যাগ করিলেন। নবাব মুজফ্‌ফরের যে প্রকার সন্ধিপ্রস্তাব তিনি এতকাল পুনঃ পুনঃ অবজ্ঞাসহকারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবার সেইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এবারেও রণজিৎ রিক্তহস্তে রাজধানীতে ফিরেন নাই।

অনন্যসুলভ অধ্যবসায়ী রণজিৎ কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। বাধা পাইয়া তাঁহার বিজয়-বাসনা পূর্ব্বাপেক্ষাও বাড়িয়া গেল। শিখ-নায়কগণ সসৈন্যে মাঝে মাঝে মুলতান আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ মুলতানজয়ের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। এবারে আঠারসহস্র শিখসৈন্য যুবরাজ খড়্গ সিংহ ও মিশ্র দেওয়ান চাঁদের নায়কতায় প্রেরণ করেন। শিখবাহিনী পথিমধ্যে খাঁগড় ও মুজাফ্‌ফরগড়ের দুর্গ অধিকার করিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে মুলতানদুর্গ অবরুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ভাঙ্গীসৈন্যেরা 'জম জমা' কামানের সাহায্যে দুই স্থান দিয়া দুর্গপ্রাচীর

উড়াইয়া দিয়াছিল। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একদিন আফগান-সৈন্যেরা শিখদিগকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিল। সেদিনকার লোম-হর্ষণ যুদ্ধে আঠারশত শিখবীর জীবনদান করিয়াছিল। কিন্তু মরিতে মরিতেও শিখেরাই জয়লাভ করিতেছিল, তাহাদের জনবল বেশি ছিল। অবরুদ্ধ আফগান-সৈন্যেরা নিহত হইয়া তিন শত মাত্র অবশিষ্ট রহিল; শিখেরা দুর্গ-ফটক উড়াইয়া দিল। ২রা জুন তারিখে সাধু সিংহ নামক এক আকালী-শিখ সর্ব্বপ্রথমে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু শিখসৈন্য দুর্গাভ্যন্তরে গমন করিল। নবাব মুজফ্‌ফর ও তাঁহার পুত্রগণ হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসহ দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শুভ্র-শ্মশ্রু বৃদ্ধ নবাব অসংখ্য শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও বিন্দু মাত্র ভীত হইলেন না; তিনি বীরের ন্যায় প্রকাশ্য যুদ্ধে অসিহস্তে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মুজফ্‌ফর পাঁচ পুত্রসহ যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিখসৈন্যেরা দুর্গ অধিকার করিয়া নগর লুণ্ঠন করিল। নবাব মুজফ্‌ফরের দুইপুত্র বীরবর রণজিতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বৃত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুজাহাবাদ দুর্গও রণজিতের অধিকার-ভুক্ত হয়।

কাশ্মীরবিজয়ে মহারাজ রণজিতের রাজ্যপরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। ক্রমাগত আটবৎসর যুদ্ধের পর রণজিৎ পরম রমণীয় শৈল-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন অনুকূল যে, এই দেশ ভু-স্বর্গ নামে খ্যাত। এই লোভনীয় দেশের শাসনাধিকার লইয়া জাতিতে জাতিতে বহু লড়াই চলিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীপর্য্যন্ত এই প্রদেশ হিন্দুরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী এক মুসলমানবংশ এই ভু-খণ্ডের উপর আধিপত্য করেন। মোগল-ভুপতি আকবর দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রামের পর ১৫৮৮

খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর জয় করেন। এই সময়ে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের খ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কাশ্মীর মোগলভূপতিগণের বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়া শোভন-প্রাসাদে ও মনোহর উদ্যানমালায় শোভিত হইল। মোগল-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইবার পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মহাবীর আমেদ সাহ কাশ্মীর জয় করেন। তদবধি কাশ্মীর, তাঁহার ও তদীয় বংশধরগণের অধীন রহিয়াছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ কাশ্মীরজয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ঐ বৎসরে এবং তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি মুসলমান-অধিকৃত তিনটি ছোট ছোট রাজ্য অধিকার করিয়া কাশ্মীরবিজয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া আনিতেছিলেন। এই সময়ে আফগানরাজ সাহ মামুদ কাশ্মীরের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে শাস্তিপ্রদানের নিমিত্ত মন্ত্রী ফতে-খাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ফতেখাঁ সিন্ধুনদী পার হইবার পরে রণজিৎ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। দুইপক্ষে মৌখিকসন্ধি স্থাপিত হইল। উভয়পক্ষ একযোগে কাশ্মীর জয় করিবে, শিখেরা লুণ্ঠনলব্ধধনের তৃতীয়াংশ পাইবে এইরূপ কথা হইয়া গেল। শিখসেনাপতি মোকম চাঁদ ও ফতেখাঁ একসঙ্গে নিজ নিজ সৈন্যদলসহ বিতস্তাতীর হইতে রওয়ানা হইলেন। পির-পঞ্জাল পাহাড়ে (Pir Panjal range) উপনীত হইয়া ফতেখাঁর মনে দুরভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল। তিনি একাকী কাশ্মীরজয়-গৌরব লাভ করিবার মানসে আপনসৈন্যসহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তুষারাবৃত পার্ব্বত্যপথে শিখসৈন্যেরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত নহে সুতরাং মোকমচাঁদ তাঁহার সৈন্যদলসহ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া শিখ-সেনাপতি কৌশলে ফতেখাঁর অসদভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি এক পার্ব্বত্যনায়ককে

প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সোজাপথে যথাসময়ে কাশ্মীরে যাইয়া ফতেখাঁর সহিত মিলিত হইলেন। শাসনকর্ত্তা শত্রুভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। উভয় সৈন্যদল অক্লেশে নগর জয় করিল। ফতেখাঁ ঘোষণা করিলেন যে, শিখেরা লুণ্ঠন-লব্ধ ধনের ভাগ পাইবে না। মোকমচাঁদের সৈন্যবল যথেষ্ট ছিল না, তিনি কোনো গোলমাল না বাঁধাইয়া কাবুলের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সাহ সুজাকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। এই দুর্ভাগ্য নরপতি সহোদরকর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন এবং এই সময়ে কাশ্মীর নগরে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সাহ সুজার পত্নীর অনুরোধে রণজিৎ সুজাকে উদ্ধার করেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোহিনুর মণি লাভ করেন। এই মহামূল্য মণি আড়ম্বরপ্রিয় মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের দরবারগৃহের প্রধান শোভন-সামগ্রী ছিল। প্রসিদ্ধ লুণ্ঠনকারী নাদের সাহ দিল্লীনগর লুণ্ঠন করিয়া অপরাপর দ্রব্যের সহিত এই মণিটি লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সাহ সুজা এই মণির অধিকারী হইয়াছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন—রণজিৎ সুজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এই মণি আদায় করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে, কোনো ইংরাজ একবার মহারাজ রণজিৎকে কোহিনুর মণির মূল্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলেন—"ইহার মূল্য পাঁচ জুতা অর্থাৎ যাঁহার বলপ্রকাশের ক্ষমতা আছে তিনিই ইহার অধিকারী হইতে পারেন।" ফলে তাহাই হইয়াছে। ইংরাজেরা বাহুবলে পঞ্চনদপ্রদেশ জয় করিয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের পুত্রের নিকট হইতে কোহিনুর লইয়া গিয়াছেন।

লুণ্ঠিত ধনের অংশ না পাইয়া রণজিৎ ফতেখাঁর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। মহারাজ এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবিধান করিতে অভিলাষী

হইলেন। তিনি সিন্ধুতীরবর্ত্তী আটক দুর্গের অধ্যক্ষ জহান্দাদ খাঁকে কোনোক্রমে বাধ্য করিয়া উক্ত দুর্গ হস্তগত করেন। আটক দুর্গ রণজিতের করায়ত্ত হইয়াছে দেখিয়া ফতেখাঁর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি রণজিৎকে ঐ দুর্গ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রণজিৎ জানাইলেন যে, কাশ্মীর-লুণ্ঠন-লব্ধ ধনের ভাগ না পাইলে তিনি কিছুতেই আটক দুর্গ আফগানদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। নির্ব্বিবাদে আটক দুর্গ পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবে না বুঝিতে পারিয়া ফতেখাঁ তাঁহার ভ্রাতা আজমখাঁকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সসৈন্যে দুর্গ জয় করিতে চলিলেন। শিখেরাও সেনাপতি মোকমচাঁদের অধীনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। শিখসেনাপতি আটকের নিকটবর্ত্তী হয়দারু নামক স্থানে পাঠানসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। একদল শিখসৈন্যকে পরাজিত করিয়া আফগানসৈন্যেরা যখন বিজয়গর্ব্বে নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন মোকমচাঁদ তাহার সৈন্যবলসহ তাহাদের উপর ভীষণবেগে পতিত হইলেন। আফগানেরা পরাজিত হইল, ফতেখাঁ পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এইদিন ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন শিখেরা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যযুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া শিখসৈন্যদের সাহস ও বলবিক্রম বাড়িয়া গেল।

মহারাজ রণজিৎ কাশ্মীরজয়ের জন্য আবার সৈন্যবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি সিয়ালকোটে অবস্থান করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ফতেখাঁর অনুপস্থিতিকে সুযোগ মনে করিয়া তিনি কাশ্মীর আক্রমণ করিতে চলিলেন। এই যাত্রা কাশ্মীর আক্রমণ করিতে যাইয়া রণজিৎ তাঁহার হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন এই সময়ে তাঁহার সৈন্যবল ও যুদ্ধোপকরণ পর্য্যাপ্ত ছিলনা; পার্ব্বত্য রাজারাও তাঁহার বিরোধী ছিলেন; সেনাপতি মোকমচাঁদও মৃত্যুশয্যায় শায়িত মুমূর্ষু সেনাপতি

রণজিৎকে যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ছিলেন, রণজিৎ তাঁহার বারণ মানিলেন না। শিখসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল—একদল মোকমচাঁদের পৌত্র রামদয়ালের, দ্বিতীয়দল মহারাজের নায়কতায় যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইল। সৈন্যবল ভাগ করিয়া রণজিৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কারণ দুর্গম পার্ব্বত্য দেশে একদল অন্য দলকে বিপদের সময়ে সাহায্য করিতে পারিল না। কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা যখন রামদয়ালকে পরাজিত করেন তখন মহারাজ তাঁহার সৈন্যগণসহ বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। পার্ব্বত্য রাজারাও সময় বুঝিয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন, রণজিৎ কোনোরূপে সসৈন্যে লাহোরে ফিরিয়া আইলেন।

বীরবর রণজিতের চরিত্র অতি অদ্ভুত উপাদানে গঠিত। কোনো প্রকারের বিপদে বা পরাভবে তাঁহার চিত্ত দমিয়া যাইত না। কাশ্মীরের দিকে তাঁহার সতৃষ্ণদৃষ্টি ন্যস্ত রহিল—তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কাশ্মীরজয়ের এক সুযোগ পাইলেন—শাসনকর্ত্তা আজমখাঁ তখন রাজধানী হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রণজিৎ অনতিবিলম্বে সেনাপতি মিশ্র দেওয়ান-চাঁদ ও রামদয়ালের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠাইলেন। জবর খাঁ নামক জনৈক সেনানায়ক আফগানসৈন্যসহ কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া হার মানিলেন; অতি অল্পায়াসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। দেওয়ান মোকমচাঁদের পুত্র মতিচাঁদ এই প্রদেশে প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বীরকেশরী রণজিৎ কাঙ্গ্রা ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করেন। কোনো সম্ভ্রান্ত রাজপুতবংশীয় রাজারা বহুকাল হইতে এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঐ বংশীয় রাজা

সংসার চাঁদ বীর বলিয়া প্রজাদের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। গুরখা-নায়ক অমরচাঁদের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল, তিনি ক্রমাগত চারিবৎসর কাল সংসারচাঁদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন। সংসার হীনবল এবং অনন্যোপায় হইয়া মহারাজ রণজিতের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন।

বীরবর রণজিতের সহিত সংগ্রামে গুরখা-নায়ক পরাভূত হইলেন। তিনি স্বীয় অধিকারভুক্ত একটি দুর্গ রণজিৎকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ মিটাইয়া কাঙ্গ্রা ছাড়িয়া স্বদেশে গমন করেন। রণজিৎ কেবল মাত্র কাঙ্গ্রা-দুর্গ আপনার শাসনাধীন রাখিলেন, অবশিষ্ট রাজ্য সংসারচাঁদকেই প্রদান করিলেন। সংসারচাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রণজিতের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। রণজিৎ তাঁহার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া কাঙ্গ্রা স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

ষোড়শ অধ্যায়

সীমান্তসংগ্রাম

রণপণ্ডিত রণজিতের জীবন যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কাশ্মীরবিজয়ের পরে হজার প্রদেশের

প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্দ্দান্ত মুসলমানেরাও তাঁহার নিকট অনায়াসে পরাভব স্বীকার করে নাই। ইতিপূর্ব্বে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে হুকুম সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশে আটক ও হজ্জার প্রদেশে শিখ-শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি আটক দুর্গ হইতে আফগানদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হুকুম সিংহ জনৈক ধনাঢ্য মুসলমানকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র দেশবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। রণজিৎ বেগতিক দেখিয়া হুকুমের পরিবর্ত্তে দেওয়ান রামদয়ালকে ঐ প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 'ইয়ুসাফজাই' ও 'স্বাৎ' নামক দুইটি মুসলমানসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গণ্ডাগড় দুর্গে মিলিত হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাকে দুই একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাভূত করিয়া মুসলমানদিগের আত্মশক্তির প্রতি প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। এবারে তাহাদের জনবল শিখদের অপেক্ষা কম ছিল না। অদম্য উৎসাহের সহিত তাহারা শিখদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছিল। একদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল। সায়ংকালে রণ-ক্লান্ত শিখেরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। পলায়নপর শিখ-সৈন্যেরা শাসনকর্ত্তাকে পশ্চাতে রাখিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প কয়েকজনমাত্র শরীররক্ষকসহ শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয়বার মুসলমানগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। শিখেরা নায়কের মৃত্যুতে হতোদ্যম হইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর সর্দ্দার অমরসিংহ সীমান্তপ্রদেশের বিদ্রোহদমনার্থ উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনিও মুসলমানদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পেশবার প্রদেশ মহারাজ রণজিতের অধীন করদ

রাজ্যে পরিণত হয়। ইয়ার মহম্মদ খাঁ নামক এক আফগান পেশবারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি রণজিতের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করায়, তাঁহার সহোদর আফগানরাজ্যের মন্ত্রী মহম্মদ আজিম খাঁ ক্রুদ্ধ হইলেন। আজিম খুব লোক-প্রিয় ও প্রতাপশালী ছিলেন, তিনি সীমান্তপ্রদেশ হইতে শিখশাসনের উচ্ছেদসাধনমানসে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। আটকের নিকটবর্ত্তী থেরাইনামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর সীমান্তপ্রদেশে শিখপ্রাধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল। সেনাপতি ভেণ্টুরা, জমাদার কুশলসিংহ, বুধসিংহ এবং মহারাজ রণজিৎ শিখ-বাহিনীসহ যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। আফগানপক্ষে আজিমখাঁ স্বয়ং সেনানায়কের কার্য্য করিয়াছিলেন। এবার আফগানেরা পরাজিত হইল, তাহারা সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া পলায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। বিজয়ী রণজিৎ যুদ্ধান্তে পেশবার লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধনরত্ন লাভ করেন। ইয়ার মহম্মদকে পেশবারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

মহারাজ রণজিৎ কোনোকালে সীমান্তপ্রদেশে শান্তিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই। এই প্রদেশের বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত তিনি নির্ব্বিকারে আপনার ধনবল ও জনবল ক্ষয় করিয়াছেন। অনেক সুবিখ্যাত সেনাপতি এই প্রদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিয়াছেন। এস্থলে সেই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বিবৃত করা অসম্ভব। ওহাবি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহম্মদ সাহ একবার মুসলমান-দিগকে শিখদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। হজার প্রদেশের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা হরিসিংহের কঠোর ব্যবহার উপলক্ষ করিয়া বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দারবন্দনামক

স্থানে মুসলমানে ও শিখে লড়াই হইল। ক্রমে বিদ্রোহীদের দল বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পর বৎসর তাহাদের সংখ্যা শিখদের পাঁচগুণ হইয়া গেল। বহুকষ্টে হরিসিংহ একটা যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। বিজয়ী হইলেও তাঁহার বিপদের অবধি ছিল না। রণজিৎ অবিলম্বে হরিসিংহের সাহায্যার্থ বুধসিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ পাঠাইলেন। এইরূপে শিখ-পক্ষের সৈন্যবল বাড়িয়া গেল, তাহারা নূতন উৎসাহের সহিত আবার যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। অকোরানামক স্থানে মুসলমানে শিখে একটা যুদ্ধ ঘটিল। যুদ্ধে শিখদের জয় হইল বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে প্রায় পাঁচ শত শিখ জীবন ত্যাগ করিয়াছিল। জগিরানামক স্থানে শিখে ও মুসলমানে আর একটা ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। অসংখ্য মুসলমান এই যুদ্ধে জীবনত্যাগ করিল; সৈয়দ আহম্মদ দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু এবারে এমন পরাজয় হইল যে, তাঁহার আর শীঘ্র মাথা তুলিবার শক্তি রহিল না।

মহারাজ রণজিৎ স্বয়ং হরিসিংহকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সৈয়দ পরাজিত হইয়াছেন। তখন তিনি পেশবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানকার মুসলমানশাসনকর্ত্তা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সে কারণে মহারাজ বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষক এই শাসনকর্ত্তাকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। এবারও তিনি সসৈন্যে পেশবার লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধনরত্নলাভ করিলেন। সৈন্যদের অত্যাচারে নগর শ্রীহীন হইল। লাঞ্ছিত শাসনকর্ত্তা, রণজিৎকে অতিরিক্ত করপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া আবার তাহার অনুগ্রহ লাভ করিলেন। ভবিষ্যৎ সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ তিনি তাঁহার এক পুত্রকে মহারাজ রণজিতের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

নও নিহাল সিং

অতঃপর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কুমার নাওনিহালসিংহ ও হরিসিংহ কর আদায়ের ভাণ করিয়া আট সহস্র সৈন্যসহ পেশবার জয় করিতে চলিলেন। এবার বারাকজাই মুসলমানেরা একপ্রকার বিনা যুদ্ধে হার মানিল। পেশবার রণজিতের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু আফগানেরা বিনা যুদ্ধে তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আমীর দোস্তমহম্মদ পেশবার পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে নগর আক্রমণ করিলেন। শিখসৈন্যসহ ফকির আজিজুদ্দিন আফগানদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিশাল শিখ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে আমীর সাহসী হইলেন না, তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

কুমার নাওনিহালসিংহ সমগ্র পেশবারপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্তিপ্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে শিখেরা খাইবারপাশের নিকট একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এই সময় হইতে সীমান্তপ্রদেশে শিখ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল বটে কিন্তু তথাকার বিদ্রোহ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

ওদিকে আফগানের আমীর শিখদের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত সৈন্যবল সংগ্রহ করিতেছিলেন। বিশসহস্র পদাতিক, সাতসহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র বন্দুকধারী সৈন্য ও আঠারটা কামানসহ সেনাপতি মহম্মদ আকবর খাঁকে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে জামরাদনামক এক নগরে এই বিশালবাহিনী উপনীত হইল। এই অরক্ষিত নগরদুর্গে কেবলমাত্র আটশত শিখ-সৈন্য বাস করিতেছিল। আফগানসৈন্যগণ অবলীলাক্রমে নগর অবরোধ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। হরিসিংহ জ্বরাক্রান্ত হইয়া এতদিন পেশবার নগরে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ছয়-

দিন কঠোর যুদ্ধের পরে যখন আফগানেরা দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া শিখ-সৈন্যদিগের উপর পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সহসা হরিসিংহ বহুসংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিপন্ন শিখদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধের পরে আফগানসৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছিল। শিখেরা তাহা-দিগকে পশ্চাৎ হইতে তাড়া দিতেছিল কিন্তু সামসুদ্দিন খাঁ নামক একজন আফগানসেনানায়কের উত্তেজনায় সহসা আফগানসৈন্যেরা পুনর্ব্বার শিখদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। হরিসিংহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্ব শিখসৈন্য-দিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বীরবর হরি সিংহ গুলি-বিদ্ধ হইয়া সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন; তাঁহার মৃত্যুতে একেবারে নিরুদ্যম হওয়ায় শিখসৈন্যগণের পরাভব হইল।

শিখ-বাহিনীর পরাজয়-বার্ত্তা লাহোর নগরে পঁহুছিবা মাত্র আবার যুদ্ধ-সজ্জা আরম্ভ হইল। এবার কুমার নাওনিহাল সিংহ, খড়্গসিংহ, সেনাপতি ভেণ্টুরা ও জমাদার কুশলসিংহ সেনানায়ক হইয়া সীমান্ত-সংগ্রামে গমন করেন। শিখবাহিনীর আগমনসংবাদ পাইবামাত্র আফগানেরা জালালাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

রণজিতের অন্তিমজীবন

কঠোর সংগ্রামে ও অমিত পান-দোষে রণজিতের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে

আক্রান্ত হইলেন। কিছুদিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিলেও তিনি দুষ্ট ব্যাধির আক্রমণ হইতে একেবারে উদ্ধার পাইলেন না। কোনোরূপে তিনি অঙ্গসঞ্চালন করিবার শক্তি লাভ করিলেন। কিছু দিন তাঁহার বাক্যকথনের ক্ষমতা ছিল না; ক্রমে অস্পষ্টভাবে বাক্যোচ্চারণ-শক্তিও জন্মিয়াছিল কিন্তু জিহ্বার জড়তা আর দূর হইল না।

মহারাজের অনুচর ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার এই আংশিক আরোগ্য-লাভেও পরম আনন্দিত হইলেন। শিখ-সর্দারেরা বৃদ্ধ ও রুগ্ন মহারাজকে পূর্ব্ববৎ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহ ও ফকির আজিজুদ্দিন রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন।

রোগ হইতে আংশিক আরোগ্যলাভের পর কিছুদিন মহারাজের চলচ্ছক্তি ছিল না। দোলায় চড়িয়া তিনি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন, তাঁহার বাক্যকথনের শক্তি ছিল না, ইঙ্গিত করিয়া অন্যকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার বলিষ্ঠ বিশাল বপু যখন এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তখনো তিনি মদ্যপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। জিহ্বার জড়তা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত তিনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রদ্বারা চিকিৎসিত হইতেছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার পৌত্র নিহালসিংহের বিবাহ-উপলক্ষে সার হেন্‌রি ফেন লাহোরে গমন করেন। উৎসবানন্দে মহারাজ তখন আত্মহারা হইয়া অতিথির সহিত যথেচ্ছ মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন শতদ্রু পার হইয়া ফেরোজপুরে গভর্ণর জেনারেল অকল্যাণ্ডের সহিত দেখা করিতে গমন করেন তখন তাঁহার মনের বল ও উৎসাহ অক্ষুণ্ন থাকিলেও শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অপরের সাহায্যব্যতীত তিনি অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন না, অসি ও বন্দুক ধারণের শক্তি তাঁহার ছিল না।

এইবৎসরই তিনি দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলেন। ফকির আজিজুদ্দিন অক্লান্তভাবে মহারাজের চিকিৎসা ও সেবা করিতে লাগিলেন, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আহূত হইলেন। এবারে আর করাল ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবেন না জানিয়া তিনি যুবরাজ খড়্গসিংহকে শয্যাপার্শ্বে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি দরিদ্র ও সাধু সজ্জনকে পঁচিশলক্ষ মুদ্রা দান করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জুন তারিখে মহারাজ রণজিৎ সিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিখ রাজ্যের পতন

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিখরাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। তিনি ধর্ম্মবলে বলী না হইলেও স্বীয় সামরিক প্রতিভার সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড সম্প্রদায়গুলিকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই ঐক্য সময়ের জন্য পঞ্চনদপ্রদেশে এক মহাশক্তি জাগরিত করিয়াছিল। শিখদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভকে কোনো কোনো বৈদেশিক ইতিহাস-লেখক একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন; আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপক বাবা নানক হইতে আরম্ভ করিয়া দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত

গুরুগণ ধর্ম্মের রসসঞ্চার দ্বারাই শিখ-সম্প্রদায়কে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সংঘর্ষ এই সম্প্রদায়কে দিন দিন প্রবল করিয়া দিতেছিল। মহাত্মা গুরুগোবিন্দ অত্যাচারী মোগলদলের দর্প চূর্ণ করিয়া পঞ্চনদপ্রদেশে স্বাধীন শিখ-ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উজ্জ্বল উচ্চলক্ষ্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি অকালে জীবনলীলা শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শিখসম্প্রদায় নায়কশূন্য হইয়া, কঠোর বিপদের মধ্যে পতিত হইল। ছোট ছোট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল; শিখেরা সমবেত হইয়া বহিঃশত্রু তাড়াইয়া দিয়া স্বাধীন হইল বটে কিন্তু সেই কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। রণজিৎ সিংহ এই সময়ে খণ্ডশক্তি-গুলিকে একশাসনসূত্রে বাঁধিয়া রাষ্ট্র গঠন করেন, কিন্তু যে ধর্ম্মভাব শিখসম্প্রদায়ের উদ্ভবকাল হইতে ইহাকে প্রাণবান্ করিয়া রাখিয়াছিল রণজিৎ সেই ভাবের সহিত যোগরক্ষা করিয়া স্বদেশবাসীদের ভেদবুদ্ধি নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তাহারা তাঁহার গুণ-মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট মাথা নত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের তুলনায় জাতীয় স্বার্থ, সুশৃঙ্খলতা ও শান্তিকে বড় বলিয়া মনে করিতে শিখে নাই। পঞ্চনদপ্রদেশে যদি তখন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রবলতা থাকিত তাহা হইলে রণজিতের মৃত্যুর পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া অপরিণত শিখ-রাষ্ট্রটাকে অকালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত না। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার তুল্য প্রতিভাশালী হইলে তিনি দেশের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা কেহই তেমন প্রতিভাবান্ ছিলেন না। রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব, উজীরী প্রভৃতি পদ লইয়া প্রবল বিরোধ দেখা দিল। ক্রমে দেশমধ্যে সর্ব্বত্র অরাজকতা

ও অশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতে লাগিল। সৈন্যদল দেশমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। তাহারা অর্থবিনিময়ে উচ্চ উচ্চ পদগুলি বিক্রয় করিতে লাগিল; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি হাঁকিতেন তিনিই প্রার্থিতপদ লাভ করিতেন। সৈন্যদের প্রতিনিধিরাই ভাঙ্গাগড়ার কর্ত্তা হইলেন। বিনা রক্তপাতে কেহ ছোট বড় কোনো পদ লাভ করিতে পারিতেন না!

রণজিতের মৃত্যুর পর যুবরাজ খড়্গ সিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনদক্ষতা কিছুমাত্র ছিল না। চেৎসিংহ নামক জনৈক চাটুকার বন্ধুর প্ররোচনায় তিনি তাঁহার পিতার আমলের বিজ্ঞ উজীর ধ্যানসিংহকে পদচ্যুত করেন। বৃদ্ধ উজীরকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। অপমানিত ধ্যান সিংহ মহারাজ খড়্গ সিংহের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া রাজকুমার নাওনিহাল সিংহের সহিত যোগদান করিয়া খড়্গ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মদ্রোহের সূত্রপাত হইল। চেৎসিংহ উজীরীপদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পদগৌরব-লাভের পরে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। একদিন প্রভাতে ধ্যানসিংহ সসৈন্যে রাজপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজ খড়্গসিংহের সম্মুখেই তাঁহার চাটুকার উজীরের শিরচ্ছেদন করেন! তিনমাসমধ্যে মহারাজ খড়্গসিংহ সমস্ত রাজ-অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন—তাঁহার পুত্র নিহাল সিংহ পিতার বর্ত্তমানেই রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী বৎসর খড়্গসিংহের মৃত্যু হইল—কেহ কেহ মনে করেন বিষ-প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পিতার সমাধিকার্য্য শেষ করিয়া কুমার নাওনিহাল সিংহ যখন রাজধানীতে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তিনি নিহত হইলেন!

রাজ-সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। রাজকুমার

সেরসিংহ লাহোরে ছিলেন না, তাঁহার আগমনপর্য্যন্ত ধ্যানসিংহ ও ফকির আজিজুদ্দিন প্রভৃতি প্রাচীন বিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিগণ নিহাল সিংহের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইতে দেন নাই। সের সিংহের আগমনের পর যখনই এই সংবাদ প্রচার হইল তখনি চারিদিকে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সময়ে কুমার নিহালসিংহের পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন বলিয়া কুমারের জননী চাঁদকৌঁড় রাজ্যপরিচালনের সমস্ত অধিকার দাবী করিয়া বসিলেন। ও দিকে সের সিংহও রাজপদলাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঘোর আত্মদ্রোহ আরম্ভ হইল। সের সিংহ সৈন্যদিগের প্রিয় ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজধানী অধিকার করিলেন। রাণীমাতা চাঁদ-কৌঁড় দুর্গে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন, পাঁচদিন সংগ্রামের পরে তিনি বাধ্য হইয়া আপনার দাবী ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সের সিংহ রাজপদ লাভ করেন, কিন্তু রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল না। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ, অশান্তির পর অশান্তি দেখা দিতে লাগিল। দেশব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগে সৈন্যেরা প্রবল হইয়া উঠিল; তাহারা নিজেদের বেতনবৃদ্ধি ও কতিপয় রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিল। মহারাজ সেরসিংহ তাহাদের অন্যায্য দাবী রক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া যাইয়া অনেক রাজকর্ম্ম-চারীর শিরশ্ছেদন করিল! য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহ চলিতে লাগিল। লোকের ধনপ্রাণ-রক্ষার কোনো উপায় রহিল না। কয়েক মাস সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচার পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। অবশেষে দুর্দ্দান্ত সৈন্যদল আপনাদের অমিতাচারে আপনারাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং নিজেদের অসঙ্গত দাবী খর্ব্ব করিয়া মহারাজ সেরসিংহের সহিত রফা করিল। কিছুকালের

জন্য দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। সৈন্যদল তাহাদের পশুবলের আস্বাদন পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে এমন কোনো শক্তি দেশমধ্যে নাই, সুতরাং তাহাদের স্পর্দ্ধিত মাথা কাহারো নিকট অবনত হইত না। সৈন্যবিভাগ হইতে সংযম ও বশ্যতা একবারে উঠিয়া গেল।

মহারাজ সেরসিংহ তাঁহার পরলোকগত জনক রণজিতের পদাঙ্কা-নুসরণ করিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই ইংরাজ-প্রীতিই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। একবার তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ গুজব প্রচারিত হইয়াছিল যে, তিনি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজসৈন্যেরা আফগানিস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পঞ্চনদপ্রদেশ অতিক্রম করিতেছিল, তখন শিখসর্দ্দারেরা ইংরাজ-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে যাত্রা সের সিংহ তাহাদিগকে কোনোরূপে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার এই ইংরাজ-প্রীতি শিখদিগকে এমন ক্রোধোন্মত্ত করিয়া ফেলিল যে, অচিরে সেরসিংহকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। অল্পদিনমধ্যে তিনি ও তাঁহার পুত্র পরিজন একে একে নিহত হইলেন! বৃদ্ধ উজীর ধ্যানসিংহ ষড়যন্ত্রকারীদের অগ্রণী ছিলেন। সের সিংহের মৃত্যুর পরে রাজপদ লইয়া লাহোরে আবার বিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধের সময়ে ধ্যানসিংহ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ষড়যন্ত্র-কারীরা তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকেও হত্যা করিল। হত্যার পর হত্যা চলিতে লাগিল! ধ্যান সিংহের পুত্র হীরা সিংহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধগ্রহণ-মানসে যুগপৎ প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া সৈন্যদিগকে বশীভূত করিয়া কুচক্রীদিগকে নিহত করেন।

এই সময়ে শিখসর্দ্দারেরা এক সভায় মহারাজ রণজিতের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র দলিপ সিংহকে রাজা নির্ব্বাচন করেন। হীরা সিংহ উজীর নিযুক্ত হইলেন। বিদ্রোহ থামিল না—সৈন্তেরা আবার ক্ষেপিয়া উঠিল—তাহারা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। সৈন্যদের দাবী অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। ও দিকে ধ্যান সিংহের এক ভ্রাতা উজীরী পদ দাবী করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। হীরা সিংহের সহিত বিবাদে তাঁহার পিতৃব্য নিহত হইলেন। রাজপদ লইয়াও বিরোধ আরম্ভ হইল, কতিপয় শিখ-সর্দ্দারের প্ররোচনায় রাজকুমার কাশ্মীর সিংহ ও পেশওয়ার সিংহ রাজপদ-প্রার্থী হইলেন। দলিপ সিংহের জননীর ষড়যন্ত্রে কুমারদ্বয় নিহত হইলেন। যে মন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার পুত্র রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকেও তিনি হত্যা করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। রাণী তাঁহার সহোদর জোয়াহির সিংহকে ঐ মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত করেন।

সৈন্তেরা রাণীর অনাবশ্যক হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা রাণীর সহোদর জোয়াহির সিংহকে সমস্ত অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। জোয়াহির সৈন্যদলের সমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি তাহাদের এই অনুরোধ অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিলেন। সৈন্তেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া রাণীকে জানাইল—"আপনি আপনার সহোদরকে লইয়া আমাদের শিবিরে উপনীত হইবেন, অন্যথা আমরা আপনার পুত্রকে সিংহাসন-চ্যুত করিব।" রাণী বিপন্ন হইলেন, উন্মত্ত সৈন্যদের আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। রাণী স্বীয় পুত্র ও সহোদরকে সঙ্গে লইয়া সেনানিবাসে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য রাণী নানারূপ চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত

কাতরতা ও কৌশল ব্যর্থ হইল--ক্রোধান্ধ সৈনিকদের শাণিত তরবারির আঘাতে জোয়াহির সিংহের শির ছিন্ন হইল! ভ্রাতার শোকে রাণী অধীর হইয়া এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধগ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শিখরাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সর্ব্বত্র ভীষণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল; শাসন-বন্ধন-মুক্ত উন্মত্ত সৈন্যদলের ভয়ে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীপর্য্যন্ত শঙ্কিত থাকিতেন। এতদিন তাহাদিগকে অর্থ-দ্বারা বশীভূত করা হইত, এখন রাজকোষ অর্থশূন্য হওয়ায় তাহাও সাধ্যাতীত হইল। দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে এক কপর্দ্দকও রাজস্ব আদায় হইত না। ইংরাজ-অধিকৃত কোনো কোনো স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অর্থাভাব দূর করিবার কল্পনা কাহারো কাহারো মনে উদিত হইল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইংরাজদের সহিত সন্ধিসূত্রে মিত্রতা স্থাপনের পর হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত চিরকাল উক্ত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই পঞ্চনদপ্রদেশে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছিল—ধীরে ধীরে এই বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজ্যের অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত শিখসর্দ্দার ও খালসাসৈন্যদলের প্রতিনিধিগণ এক সভায় মিলিত হইলেন। উক্ত সভায় কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য করেন যে, শিখেরা দিন দিন আপনাদের শৌর্য্য বীর্য্য হারাইতেছেন—অচিরে রণ-চর্য্যার কোনো সুযোগ না পাইলে তাহারা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িবেন। সৈন্যদের প্রতি-নিধিগণ যুদ্ধের নাম শুনিয়া নাচিয়া উঠিলেন। অনেকেই শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ধীর-প্রকৃতি কোনো কোনো ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু

অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের মত কাপুরুষোচিত মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিলেন। যুদ্ধ করাই নির্দ্ধারিত হইয়া গেল—খালসা সৈন্যদল যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দলিপসিংহের জননী এইরূপ যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন না। নিতান্ত অদূরদর্শী ব্যক্তির ন্যায় তিনি ভাবিলেন এই সংগ্রামে তাঁহার লাভ ভিন্ন কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। খালসাসৈন্যের উৎপীড়নে অধীর হইয়া তিনি তাহাদের নিপাত কামনাই করিতেন। রাণী মনে করিলেন, ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে তাহারা নিহত হইলে তাঁহারই শত্রুক্ষয় হইবে—পক্ষান্তরে খালসাসৈন্যদল রণজয়ী হইলে, তিনি লুণ্ঠন-লব্ধ ধনের কিঞ্চিৎ অংশ পাইবেন। শিখ-জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়-মূলক এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রাজা গোলাপসিংহেরও যোগ ছিল; তিনি খালসাসৈন্যদিগকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধকালে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

উনবিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি

প্রথম শিখযুদ্ধ

অতুলনীয় বীরত্ব-সম্পদের অধিকারী হইয়াও শিখজাতি স্বাধীনতারক্ষা করিতে পারিল না। শিখদের তেজস্বিতা সংযমকে লঙ্ঘন করিয়া অনর্থের

হেতু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা আপনাদের তেজোবহ্নিতে ধনপ্রাণ ও স্বাধীনতা আহুতি প্রদান করিল। রণজিতের মৃত্যুর পরে পঞ্চনদপ্রদেশে এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এই উদ্ধত জাতিকে নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ রাখিতে পারেন।

খালসাসৈন্যদল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে তেজসিংহ শিখসৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেম। লাহোর হইতে ইংরাজপক্ষীয় সংবাদ-দাতারা রাজ-কর্ম্মচারীদের নিকট পুনঃপুনঃ আসন্নসংগ্রামের খবর পাঠাইতেছিলেন। তদানীন্তন গবর্ণরজেনারেল স্যার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এই সংবাদটার প্রতি যথোপযুক্ত আস্থা স্থাপন করিলেন না। সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি স্যার হিউ গফ মীরাট এবং সীমান্তপ্রদেশের সৈন্যদলগুলিকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। যুদ্ধার্থী শিখেরা যখন শতদ্রুতীরে সমবেত হইতেছিল তখন গবর্ণরজেনারেল যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ষাটসহস্র সুশিক্ষিত শিখসৈন্য শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিল। শিখবাহিনী একশত কামান সহ ফেরোজপুর-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তথাকার ইংরাজ-সেনানিবেশে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল বলিয়া প্রধান সেনাপতি স্যার হেনরি গফ ও গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। উজীর লাল সিংহের অধীন খালসা সৈন্যদল এই সময়ে অবিভক্ত থাকিয়া ক্ষিপ্রগতি ফেরোজপুরে দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিলে ইংরাজেরা বিপন্ন হইয়া পড়িতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদূরদর্শী শিখসেনানায়কগণ এই সময়ে আপনাদের সৈন্যদল বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ইংরাজসৈন্যদলগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। শিখদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নানা স্থান হইতে ইংরাজসৈন্যদল আসিয়া

সমবেত হইতেছিল। আম্বালা ও লুধিয়ানার সৈন্যদলসহ হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ও গফ সাহেব ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ফেরোজপুরের বিশ মাইল দূরবর্ত্তী মুদ্‌কি নামক স্থানে উপনীত হইলেন। যুদ্ধলোলুপ শিখসৈন্যেরাও অগ্রসর হইল। ইংরাজপক্ষে এগার সহস্র সৈন্য ও বিয়াল্লিশটা কামান, শিখপক্ষে ত্রিশ সহস্র সৈন্য ও চল্লিশটী কামান ছিল। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বেলা চারি ঘটিকার সময়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অনুচ্চ-বালুকা-শৈলের উপরিভাগে ঝোঁপের আড়ালে থাকিয়া শিখসৈন্যেরা অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ করিতেছিল; তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানে ইংরাজসৈনিকেরা হত ও আহত হইতে লাগিল। ইংরাজপক্ষীয় পদাতিকেরা ঐ গোলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বেলা চারিটা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল। গাঢ় অন্ধকারে যখন ইংরাজ পক্ষীয় পদাতিক ও অশ্বারোহীরা ভীষণবেগে শিখসৈন্যদের উপর পতিত হইল তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুদ্‌কির দশ মাইল দূরে ফেরোজসাহ নামক স্থানে শিখদের একটি দুর্গ ছিল। তাহারা দ্রুতবেগে তথায় যাইয়া আশ্রয় লইল। মুদ্‌কির যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হইলেও এই যুদ্ধে শিখপক্ষের অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ হারাইয়াছিল। বিজয়ী ইংরাজেরা যুদ্ধান্তে শিখদের ১৭ টা কামান প্রাপ্ত হইল কিন্তু ইংরাজপক্ষীয় ১৩জন য়ুরোপীয় ও ২ জন দেশীয় কর্ম্মচারী এবং ২০০ সৈনিক ও সহিস নিহত হইয়াছিল। আহত কর্ম্মচারী ও সৈনিকের সংখ্যা ৬৫৭।

মুদ্‌কিযুদ্ধে শিখেরা বিশেষ কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বলিয়া সেদিনের পরাজয় তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভীত বা নিরাশ করিতে পারে নাই। ভবিষ্যৎ জয়লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আবার তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা তাহাদের আশ্রয়-স্থল ফেরোজ সাহ দুর্গটি যথাসম্ভব সুরক্ষিত করিয়া তুলিল।

এদিকে ইংরাজদের সৈন্যবল দিন দিন বাড়িতেছিল—মুদ্‌কি যুদ্ধের পর দিন হইতেই নব নব সৈন্যদল আসিতেছিল—২১এ ডিসেম্বর তারিখে ফেরোজপুরের সৈন্যেরাও আসিয়া প্রধান সেনাপতির সৈন্যদের সহিত মিলিত হইল। প্রধান সেনাপতি স্যার হিউ গফ আর কালবিলম্ব না করিয়া ঐ দিনই সপ্তদশ সহস্র সৈন্য ও ৬৯টা কামানসহ শিখ সেনা-নিবেশের অনতিদূরে যুদ্ধার্থে উপনীত লইলেন। স্যার হার্ডিঞ্জ ও প্রধান সেনাপতি মহাশয় যথাক্রমে সৈন্যদলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন।

বেলা তিন ঘটিকার সময়ে সংবাদ আসিল, শিখসৈন্যেরা ইংরাজ দিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেছে। অবিলম্বে স্যার হিউ গফ সসৈন্যে দুই মাইল অগ্রসর হইয়া বিপক্ষ সেনার সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধার্থী শিখ ও ইংরাজ-সৈন্য যে প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিল তথায় স্থানে স্থানে ঘন জঙ্গল ও বালুকাশৈল ছিল। মুদ্‌কির ন্যায় এখানেও শিখেরা অরণ্যের আড়াল হইতে গুলি চালাইতেছিল। ইংরাজপক্ষের পদাতিক সৈন্য সতর্কভাবে অগ্রসর হইয়া শিখসৈন্যদের হস্তহইতে বলপূর্ব্বক কামান ও বন্দুক কাড়িয়া লইতে লাগিল। উভয় পক্ষে ভীষণ-সংগ্রাম চলিল। সন্ধ্যাবেলা ইংরাজেরা শিখসৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দুর্গের একাংশে প্রবেশ করিল। এক মাইল দীর্ঘ, অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত সমান্তরালক্ষেত্রাকৃতি সেই দুর্গমধ্যে উভয় সৈন্যদল সংগ্রাম চালাইতে লাগিল। জীবনপাত করিয়াও ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যগণ অধিকৃত দুর্গাংশ রক্ষা করিতেছিল। এইরূপ ভাবে সেই ভীষণ রজনী কাটিয়া গেল।

এই রাত্রির বর্ণনা করিয়া স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান সচিব স্যার রবার্ট পিল মহোদয়কে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর লিখিয়াছিলেন—"২১এ ডিসেম্বরের রাত্রি আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় রাত্রি। ঐ দিন রাত্রিকালে অনাহারে অনাবৃত অঙ্গে দুঃসহ শীতে আমি সৈন্যদিগের সহিত বিনিদ্রভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াছি। সমস্ত রাত্রি আমার চক্ষুর সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল এবং আমার সাহসী সঙ্গীরা বিপক্ষের গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইতেছিল। শিখদের অবিশ্রান্ত কামানগর্জ্জনের সহিত উভয় পক্ষের জয়োল্লাস ও মৃতকল্প সৈনিকগণের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল। সৈন্যগণের মনের অবস্থা জানিবার জন্য এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি বিভিন্নদলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং সকলকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিলাম যে, প্রত্যূষে আমরা শত্রুসৈন্যের উপর ভীষণবেগে পতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিব কিংবা প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করিব।"

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম ভীষণতর হইয়া উঠিল। শিখ-সৈন্যেরা বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাইলেও সুপরিচালিত ইংরাজসেনার আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। শিখদের ৭৩টি কামান ইংরাজের হস্তগত হইল। বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে এই ভীষণ যুদ্ধে শিখপক্ষের অন্যূন পাঁচ সহস্র সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৩৭ জন য়ুরোপীয় ও ১৭ জন দেশীয় কর্ম্মচারী এবং ৬৪০ জন সৈনিক সহিস প্রভৃতি হত হইয়াছিল। আহত কর্ম্মচারী ও সৈনিকের সংখ্যা আঠারো শতের কাছাকাছি।

ফেরোজসাহ-ক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য শতদ্রুতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া নূতন নূতন সৈন্যদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে দুইবার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াও শিখসৈন্যদের সংগ্রামলালসা প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই, তাহারা আবার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রসদ ও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের অভাবের সংবাদ লাহোর দরবারে প্রেরিত হইল। যুদ্ধকুশল শিখসৈন্যেরা ইতিমধ্যেই সুদক্ষ নায়কের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিল; তাহারা রাজা গোলাপ সিংহকে তাহাদের অধিনায়কতা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। সৈন্যেরা তাহাকে উজীর-পদ প্রদানের প্রলোভনও দেখাইল কিন্তু সুচতুর গোলাপসিংহ কিছুতেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। ফেরোজসাহযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তিনি লাহোর রাজসরকারের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া গোপনে ইংরাজদের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। লাহোর-গবর্ণমেণ্ট রসদ ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া খালসা সৈন্যদলের বল বৃদ্ধি করিলেন। উন্মত্ত সৈন্যের দল লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে এইরূপ মনে করিয়া লাহোরগবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরত্ত করেন নাই, এমন কি দলিপসিংহের জননী একদিন প্রকাশ্য দরবারে সৈন্যদের প্রতিনিধি-দিগকে পরুষভাবে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন —"রমণীর পোষাক পরিয়া তোমরা আসিয়া অন্তঃপুরে বাস কর, আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব";—রমণীর তীব্র-তিরস্কারে সৈন্যদের প্রতিনিধিরা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমরা আপনার জন্য, স্বদেশের জন্য, গুরুজীর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিলাম।"

এবার পনর সহস্র শিখসৈন্য ৬৭টা কামান লইয়া লুধিয়ানার ইংরাজ-দুর্গ অবরোধ করিল। প্রারম্ভে তাহারা এমন ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চালাইতেছিল যে, ইংরাজদিগকে চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। এগারো

সহস্র ইংরাজসেনা লুধিয়ানা অবরুদ্ধদুর্গ রক্ষা করিয়া ২৮এ জানুয়ারী তারিখ (১৮৪৬) আলিওয়াল জনপদে শিখসৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সুসজ্জিত শিখসৈন্যগণ গতিশীল বিপক্ষদের উপর গোলা-বৃষ্টি করিতেছিল। সঙ্গীনধারী ইংরাজসৈন্যদল যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে শিখসৈন্যদলের উপর পতিত হইল; তখন নির্ভীক শিখবীরেরা অসি চর্ম্ম হস্তে সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু সংহার করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরে সুপরিচালিত ইংরাজসৈন্য চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

শিখবীরগণের কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে, কেহ কেহ বা নৌ-সেতু অতিক্রম করিয়া পলায়ন-কালে শতদ্রুগর্ভে, জীবন হারাইল। তাহাদের কামানগুলির ৫৬টা বিজয়ী ইংরাজসৈন্যেরা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল, অপরগুলিও শতদ্রু-গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে হত ও আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫১ ও ৪১৩।

রণজয়ী ইংরাজ-সৈন্যদল অবিলম্বে শিখদের সোব্রাও দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজপক্ষীয় পনর সহস্র সৈন্য ষাটটা কামান সহ গাঢ় কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন রাত্রিকালে অতর্কিত ভাবে নীরবে শত্রুদুর্গের সন্নিকটে উপনীত হইল। প্রভাতে কুয়াসা কাটিয়া সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইবামাত্র তাহারা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখসৈন্য ৭০টা কামান লইয়া দুর্গরক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিতেছিল। বিজয়লক্ষ্মী শিখদের প্রতি বিমুখ ছিলেন, তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইংরাজসৈন্য দুর্গ জয় করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও নদীগর্ভে প্রায় দশ সহস্র শিখ প্রাণদান করিল। ইংরাজপক্ষে ৩২০জন হত, ২০৬৩ জন আহত হইল।

প্রধান সেনাপতি স্যার হিউ গফ ১৩ই ফেব্রুয়ারী সসৈন্যে শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের ৩২মাইল দূরবর্ত্তী কসুরনামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। ১৪ই তারিখ পূর্ব্বাহ্নে গবর্ণর জেনারেলও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এদিকে সোব্রাও ক্ষেত্রে শিখবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষেরা হতবুদ্ধি হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা ইংরাজদের সহিত যে কোনো সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তাহাদের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রাজা গোলাপসিংহ ১৫ই ফেব্রুয়ারী কসুরে ইংরাজশিবিরে গমন করেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে লাহোরগবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ লাহোর নগরে এক দরবারে এইরূপে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ দলিপসিংহ, ভাই রামসিংহ, রাজলালসিংহ, সর্দ্দার তেজসিংহ, সর্দ্দার ছত্রসিংহ, সর্দ্দার রঞ্জুরসিংহ, দেওয়ান দীননাথ ও ফকিরনুরউদ্দিন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন।

রাজকোষে অর্থ ছিল না বলিয়া, লাহোরগবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগকে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার এক সন্ধি হইল। লাহোরগবর্ণমেণ্টকে ঋণমুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজা গোলাপসিংহ এককোটি টাকা প্রদানকরিয়া কাশ্মীরের শাসনাধিকার লাভ করিলেন, রাণীমাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক দলিপসিংহের অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য-পরিচালনের ভার পাইলেন। মেজর স্যার জন হেনরি লরেন্স ইংরাজগবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে লাহোর-দরবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ

দুর্ভাগ্যক্রমে লাহোরগবর্ণমেণ্ট বেশিদিন ইংরাজদের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। ডিসেম্বর মাসের সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাজা গোলাপসিংহকে অবিলম্বে কাশ্মীর প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ছিল। লাহোরগবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ইহার অন্যথাচরণ না করিলেও গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বিরোধ চালাইতেছিলেন। রাণীমাতার অনুগ্রহ-ভাজন প্রধান মন্ত্রী লালসিংহ কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাকে গোপনে পত্র লিখিয়া স্বীয় অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছিলেন। অবশেষে স্যার হেনরি লরেন্স একদল শিখসৈন্য সহ কাশ্মীরে গমন করিয়া বিবাদের মীমাংসা করেন। লালসিংহের স্বাক্ষরিত পত্র লরেন্সের হাতে পড়িল। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তিনি লাহোর হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। লালসিংহের নির্ব্বাসনে রাণী কুপিত হইলেন। এদিকে শিখসর্দ্দারদের মধ্যেও অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইংরাজ রেসিডেণ্টের প্রভুত্ব তাঁহাদের নিকট একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কার্য্যতঃ প্রকাশ না করিলেও প্রায় অধিকাংশ শিখ মনে মনে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করিতেছিল।

১৮৪৮খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে মুলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজের সহিত লাহোরগবর্ণমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হয়। পঞ্জাবরাজকে এক লক্ষ আশীসহস্র টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া মূলরাজ শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ অর্থ পরিশোধ না করায়, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট তাহা শোধ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। মূলরাজ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলেন। জনৈক শিখসর্দ্দারকে উক্তপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার নিমিত্ত দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী একদল সৈন্য

সহ মুলতানে গমন করেন। মূলরাজ প্রকাশ্যে তাঁহাদের হস্তে নগরের চাবি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে বিদ্রোহী হইয়া গোপনে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজকর্ম্মচারিদ্বয় নিহত এবং নূতনশাসনকর্ত্তা তাঁহার পুত্রগণসহ বন্দী হইলেন। লাহোর হইতে আগত সৈন্যগণ বিদ্রোহী মূলরাজের সহিত যোগদান করিল। অল্প কয়েক সহস্র সৈন্য সহায় করিয়া মূলরাজ যুদ্ধঘোষণা করিলেন। লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ নামক জনৈক তরুণবয়স্ক ইংরাজ মুসলমানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাহারা দুইবার পরাজিত হইয়া নগরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে লাহোর দরবার হইতে সের সিংহ বার সহস্র সৈন্যসহ প্রেরিত হইয়া মুলতান নগরে উপনীত হইলেন। লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সেরসিংহের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সন্দেহ অচিরে সত্যমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সেরসিংহও পরিশেষে মূলরাজের সহিত যোগদান করিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী ইংরাজেরা মুলতানদুর্গ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু এই বিরোধকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত দুর্গজয়ের পূর্ব্বে সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশে শিখদের বিদ্রোহ-বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আবার পূর্ণস্বাধীনতা লাভের জন্য শিখেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। বিদ্রোহীদের নেতারা দলিপসিংহের জননীর সহিত পরামর্শ চালাইতেছিলেন। শিখেরা পেশবার ছাড়িয়া দিবার সর্ত্তে আফগানের আমীর দোস্তমহম্মদেরও সহায়তা লাভ করিল।

ইংরাজে ও শিখে আবার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী সেনাপতি লর্ড গফ পনর সহস্র সৈন্য ও ৬৬টা কামান লইয়া চিনিওয়ানয়ালা জনপদে শিখদিগকে আক্রমণ

করেন। এই যুদ্ধে শিখেরা জয়লাভ করিল। অতঃপর ২১এ ফেব্রুয়ারী গুজরাট যুদ্ধে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ষোল সহস্র উৎকৃষ্ট শিখসৈন্য ইংরাজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

গবর্ণরজেনারেল লর্ড ডালহাউসি ২৯এ মার্চ্চ তারিখের ঘোষণা-পত্র দ্বারা পঞ্চনদপ্রদেশ ইংরাজরাজ্য-ভুক্ত করেন। পাঞ্জাব অধিকার করিয়াই ইংরাজগবর্ণমেণ্ট শিখদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। চক্ষুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া যে দিন একে একে শিখবীরেরা তাঁহাদের পরম প্রিয় অস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছিল সেদিনকার শোককর দৃশ্য দেখিয়া অনেক সহৃদয় ইংরাজও মনোবেদনা পাইয়াছিলেন। মহারাজ দলিপসিংহ ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া বিলাতে গমন করেন। শিখরাষ্ট্র ও শিখ-স্বাধীনতা সুখ-স্বপ্নের ন্যায় সহসা ভাঙ্গিয়া গেল!

সম্পূর্ণ

COOCH BEHAR.

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত

শিবাজী ও মারাঠাজাতি

সম্বন্ধে—কয়েকটি অভিমত।

ভারতী বলেন—সুখের বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখক প্রায়ই ইতিহাসের বাহ্যবস্তু, রক্ত, মাংস লইয়াই ব্যস্ত; অধিকাংশ গ্রন্থ তাই শৃষ্টাব্দে, যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা তারিখের কোনো মূল্য নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্য যথেষ্ট, কারণ ঐ সকল ঘটনার অন্তরালে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহার রহস্যভেদ না হইলে আমরা ইতিহাসের আভ্যন্তরীণ প্রাণটুকুর সন্ধান পাই না। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রাণাডে লিখিত Rise of the Mahratta Power ও কাপ্তেন গ্রাণ্টডফের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত। কিরূপে একটি জাতি গঠিত হয়, কোন্ কোন্ শক্তি ও ঘটনাদ্বারা তাহার অভ্যুত্থান ও পতন হয়, কিরূপে একটি জাতির ব্যবস্থাবিধি, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া জাতীয়জীবন প্রবাহিত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী, অধিকারবিধি প্রবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হয়;—ইহাই ইতিহাসের কঙ্কাল (Constitutional history); মারাঠাগণ কিরূপে সহসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল,—কিরূপে বিভিন্ন দলগুলি সম্মিলিত হইল, কিরূপে শিবাজী মারাঠাদিগের এই অভ্যুদয়ে আপনার ঐশীশক্তি নিয়োজিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নিরক্ষর শিবাজীর প্রতিভা কোন্ কোন উপায়ে প্রকৃষ্ট প্রকাশপথ পাইল;—বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়া, খণ্ডিত অংশগুলিকে সংযোজিত করিয়া, কিরূপে একটি সমগ্রজাতি গঠন করিল, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লইয়া শরৎবাবু গ্রন্থখানি নীরস করিয়া তোলেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্যেরও যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। আফজলখাঁর হত্যাবর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি শিবাজীচরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্কমোচনে সফল হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া মারাঠা ইতিহাসের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যবিভাগে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যথেষ্ট আদরের সামগ্রী। ভরসা করি, সাধারণ্যে ইহার বিশেষ সমাদর হইবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম, এ মহোদয়

লিখিয়াছেন—'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' পড়িলাম। আপনার প্রয়াস প্রশংসনীয়। আপনি শুধু ঘটনাবিন্যাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মারাঠাইতিহাসের উপদেশগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মারাঠাজাতি কিরূপে বড় হইল, কেন তাহাদের পতন হইল, নেতাদের চরিত্র ও শাসনপ্রণালী এবং তাহার ফল, জাতির উপর দেশের ভৌগোলিক অবস্থারও অতীতের প্রভাব,— এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আপনার বইখানিকে পূর্ণাঙ্গ ও উপদেশপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। বইখানি ছোট বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাকে শিক্ষায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথমে ছেলেদিগকে এই বই হইতে মারাঠাইতিহাস মোটামুটি শিখাইয়া, পরে অন্য বড় গ্রন্থ হইতে গল্প ও বর্ণনা শুনাইয়া ছাত্রদের জ্ঞান সহজেই বিস্তীর্ণ এবং পুস্তিকার উপদেশ আরও গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রবাসী বলেন—বহু জ্ঞাতব্য নূতন তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইবে। মহাত্মা শিবাজীর মহৎ চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। ইহাতে শিবাজীর রাজত্ব, তাঁহার বংশধরদিগের বৃত্তান্ত ও পেশোয়েদিগের শাসন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে একটি দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত, একটি নেশন সংগঠনের চেষ্টার ইতিহাস পাওয়া যাইবে। দেশের রাষ্ট্রশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করে তাহাই প্রকৃত নেশনের ইতিহাস, তাহার সূত্রপাত মারাঠারাই করিয়াছিলেন। এই শুভ প্রচেষ্টা কেন নিষ্ফল হইল তাহারও কারণ এই পুস্তকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ভূমিকা থাকাতে। তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন জাতীয় ইতিহাস কাহাকে বলে, কি অবস্থায় নেশন সংগঠিত হয়, মারাঠাজাতির বিশেষত্ব কোথায় এবং তাঁহাদের সহিত শিবাজীর কি সম্পর্ক। এই গ্রন্থ বালকদিগের গৃহপাঠ্য করা উচিত। অভিভাবকগণ বিবেচনা করিবেন। কারণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠনা ত উঠিয়াই গেল, যাহা বা হইবে তাহা বিদেশীর ইতিহাস, বিলাস অত্যাচারের ইতিবৃত্ত; আমাদের জাতীয় কথার স্থান তাহাতে নাই। সম্প্রতি অনেকগুলি ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হইল। ইহা অতি সুলক্ষণ। এক্ষণে পাঠকসাধারণ ইহার সমাদর করিলেই মঙ্গল। সমালোচ্য গ্রন্থের ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।